স্বীকৃতি

শিবনাথ শাস্ত্রীর চিত্র শশিকুমার হেস -অঙ্কিত। মূল চিত্র শ্রীমতী অবন্তী ভট্টাচার্যের সংগ্রহে আছে।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের চিত্র শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য -সম্পাদিত কঙ্কাবতী হইতে গৃহীত।

রমেশচন্দ্র দত্তের চিত্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর চিত্র শ্রীযামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় -অঙ্কিত। মূল চিত্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সংগ্রহে আছে।

প্রমথ চৌধুরীর ফোটোগ্রাফ শ্রীসুপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক গৃহীত।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ফোটোগ্রাফ শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের চিত্র শ্রীঅলকেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

শিবনাথ শাস্ত্রী ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর চিত্র দুইখানির ফোটোগ্রাফ শ্রীপরিমল গোস্বামী তুলিয়া দিয়াছেন।

সূচিপত্র

শিবনাথ শাস্ত্রী	১
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	১৬
রমেশচন্দ্র দত্ত	৩৭
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	৪৯
প্রমথ চৌধুরী	৬৮
বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৭৭
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৯০

শিল্পীগুরু শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীচরণকমলেষু

১৩৫৭
জন্মাষ্টমী

শিবনাথ শাস্ত্রী

১৮৪৭ - ১৯১৯

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর যুগান্তর (১৮৯৫) উপন্যাসখানি প্রকাশিত হইলে সমালোচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ মন্তব্য করিয়াছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর উপন্যাসের বিশেষ গুণ কি, আবার তাহার দোষই-বা কি—রবীন্দ্রনাথ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার মতে চরিত্রসৃজনে, গ্রাম্য পরিবেশকে সমবেদনার আলোতে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে, ঘটনাপ্রবাহ ও নরনারীর জীবনের উপরে কৌতুকমিশ্রিত হাস্যরসের কিরণ নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিতে শিবনাথের জুড়ি নাই। আর তাঁহার দোষ, রবীন্দ্রনাথের কথাতেই শোনা যাক—

> ··এমন সময়ে আমাদের পরমদুর্ভাগ্যবশত উপন্যাসটি অকস্মাৎ যুগান্তরে লোকান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইল।··গ্রন্থকারও নূতন বেশ ধারণ করিলেন। তিনি ছিলেন ঔপন্যাসিক, হইলেন ঐতিহাসিক; ছিলেন ভাবুক, হইলেন নীতিপ্রচারক। আমরা রসসম্ভোগের সত্যযুগ হইতে তর্কবিতর্কের যুগান্তরে আসিয়া অবতীর্ণ হইলাম। গ্রন্থকার পূর্বে যেখানে মানুষ গড়িতেছিলেন এখন সেখানে মত গড়িতে লাগিলেন, পূর্বে যেখানে আনন্দনিকেতন ছিল এখন সেখানে পাঠশালা বসিয়া গেল। এরূপ অঘটন সংঘটন হইল কেন তাহা বলিতে পারি না। [ঘটনাপ্রবাহের নশিপুর হইতে কলিকাতায় স্থানান্তর] উপন্যাসের পক্ষে কুক্ষণ; কারণ সেই উপলক্ষ্যটুকু অবলম্বন করিয়া গ্রন্থের শেষার্ধটি প্রথমার্ধের সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

লেখক ধারাবাহিক গল্পের প্রতি বড়-একটা দৃষ্টিপাত করেন নাই,

আমরাও গল্পের জন্য বিশেষ লালায়িত নহি। আমরা একজন রীতিমত মনুষ্যের আনন্দজনক বিশ্বাসজনক জীবনবৃত্তান্ত চাহি।··কিন্তু লেখক দুইখানি বহির পাতা পরস্পর উল্টাপাল্টা করিয়া দিয়া একসঙ্গে বাঁধাইয়া দপ্তরীর অন্ন মারিয়াছেন এবং পাঠকদিগের রসভঙ্গ করিয়াছেন। এ আক্ষেপ আমরা কিছুতেই ভুলিতে পারিব না।—আধুনিক সাহিত্য

খুব সম্ভব এই আক্ষেপ মিটাইবার আশাতেই রবীন্দ্রনাথ পত্রযোগে শিবনাথ শাস্ত্রীর নিকটে ভারতীর জন্য লেখা চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন—

এক্ষণে অবসরমত ভারতীর জন্য কিছু প্রবন্ধাদি লিখিয়া সাহায্য করিলে বাধিত হইব। বঙ্গসাহিত্যকে বঞ্চিত করিয়া ব্রাহ্মসমাজকেই আপনার সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করিলে চলিবে না, কারণ সাহিত্যে আপনার ঈশ্বরদত্ত অধিকার আছে।

পূর্বোক্ত সমালোচনা এবং বর্তমান পত্র দুইই ১৩০৫ (১৮৯৮) সালে লিখিত।

এখন, শিবনাথ শাস্ত্রীর উপন্যাসগুলি আলোচনার সময়ে রবীন্দ্রনাথের যুগান্তর সম্বন্ধীয় মন্তব্য মনে রাখা আবশ্যক, আর তাহা মনে রাখিয়াই আমরা অগ্রসর হইব। তাঁহার প্রধান বক্তব্য দুটি : প্রথমত শিবনাথের মত সহৃদয়তাপূর্ণ চরিত্রসৃষ্টিক্ষমতা বিরল; দ্বিতীয়ত আপনার অজ্ঞাতসারে ঔপন্যাসিক শিবনাথ কখন যেন ঐতিহাসিক ও নীতিপ্রচারক হইয়া ওঠেন, এবং তাহার ফলে উপন্যাসের অখণ্ডতা নষ্ট হইয়া যায়। খুব সম্ভব রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য শিবনাথের সাহিত্যবুদ্ধিকে অধিকতর সজাগ করিয়া দিয়াছিল, কারণ তাঁহার পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে যুগান্তরে অনুষ্ঠিত ত্রুটি অনেক পরিমাণে বর্জিত হইয়াছে। যুগান্তর উপন্যাস বাস্তবিকই যেন দুইখানি পৃথক গ্রন্থের সমবায়— একখানি ঔপন্যাসিকের রচনা, একখানি নীতিপ্রচারকের রচনা। শিবনাথের পরবর্তী উপন্যাস

তিনখানিতে— বিধবার ছেলে (১৯১৬) ও উমাকান্তকে (১৯২২)[১] একখানা বলিয়া ধরিলে দুইখানা উপন্যাসে— এই ত্রুটি বর্জিত হইয়াছে। এগুলির শিল্পগত অখণ্ডতা ক্ষুণ্ণ হয় নাই, গল্পের ধারাও অবিকল আছে। নীতিপ্রচারক নিজেকে কিছুটা যেন সংযত করিয়াছেন, আগের মত তিনি আর তেমন করিয়া ঔপন্যাসিকের কলমটা কাড়িয়া লন নাই। কাজেই দেখিতে পাই, যুগান্তরের প্রধান ত্রুটি হইতে পরবর্তী বইগুলি আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু আর-এক সংকট ঘটিয়াছে। শিবনাথের মধ্যে তিনটি সত্তা ছিল— ঔপন্যাসিক, নীতিপ্রচারক ও ঐতিহাসিক। তাঁহার পরবর্তী উপন্যাসগুলি নীতিপ্রচারকের কলমের খোঁচা হইতে অনেক পরিমাণে বাঁচিয়া গেলেও ঐতিহাসিকের আক্রমণ হইতে রক্ষা পায় নাই। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে শিবনাথের গল্প কিছুদূর অগ্রসর হইলেই ইতিহাসে পরিণত হয়। এ অভিযোগ হইতে তিনি সম্পূর্ণ রেহাই পান নাই। রবীন্দ্রনাথের অপর অভিযোগ, শিবনাথের গল্পের আনন্দনিকেতন কখন যেন পাঠশালা হইয়া দাঁড়ায়। পরবর্তী উপন্যাসগুলি অবশ্য ঠিক পাঠশালা হয় নাই ; কিন্তু পাঠশালার নীতিপ্রচারকের পক্ষে একেবারে স্বভাববর্জন সম্ভব নয়, তাঁহার স্বভাবের কিছু রেশ রহিয়া যাইবেই। তাই বলা চলে যে, যুগান্তরে যিনি ছিলেন পাঠশালার গুরুমহাশয়, পরবর্তী উপন্যাসে আসিয়া তিনি হইয়াছেন ছুটির সময়ের গুরুমহাশয়। অবকাশযাপনের গুরু যতই নীচু হোন, একেবারে অগুরু হইতে পারেন না। তবে প্রভেদটা দেখি এই যে, যিনি পাঠশালার আটচালাতে নামতা পড়াইতেছিলেন এখন তিনি ছায়াঢালা

১ "বিধবার ছেলে তাঁহার শেষ উপন্যাস। ইহা নিঃশেষিত হইলে প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য মূল পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে পিতার উপন্যাসখানির দ্বিতীয় সংস্করণ উমাকান্ত নামে প্রকাশ করেন ; ইহার ১৯শ পরিচ্ছেদটি তাঁহার নিজের রচিত।"—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'শিবনাথ শাস্ত্রী', প্রথম সংস্করণ, পৃ ৩২-৩৩

আমবাগানে বসিয়া গল্পের আসর জমাইয়াছেন। গল্পের আসর, তবে সে গল্প গুরুমহাশয়কথিত ; যতই মনোহর হোক-না কেন, তবু তাহা শেষ পর্যন্ত নীতিবাদের ফ্রেমে বাঁধানো। শিল্পের দাবিতে গল্পের যতদূর যাওয়া দরকার, নীতির দাবিতে তাহাকে অনেক সময়েই ততদূর যাইতে দেওয়া হয় নাই। ইহাকেই বলিতেছি গুরুমহাশয়ের গল্প। তবে রক্ষা এই যে পাঠশালার এখন ছুটি, পাঠশালা চলিতে থাকিলে তাঁহাকে গল্প বলিবার অনুরোধ করিতে ভরসা পাইত কে? রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার ইঙ্গিতের ফলেই হোক আর যে কারণেই হোক, শিবনাথের যুগান্তর-পরবর্তী উপন্যাসগুলি শিল্পসৃষ্টি হিসাবে অধিকতর নিখুঁত। কিন্তু তেমনি আবার যুগান্তরের সরস, প্রাণময় নরনারীরও দেখা পাই না পরের গল্পগুলিতে।

২

যুগান্তর শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রথম উপন্যাস নয়, কিন্তু প্রথমেই যে তাহার উল্লেখ করিলাম তার একাধিক কারণ। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার পূর্বসূত্র একটা কারণ। আরও কারণ এই যে, এক হিসাবে শিবনাথের সমস্তগুলি উপন্যাসেরই যুগান্তর নামকরণ চলিতে পারে। বাঙালিসমাজের একটা যুগান্তরপর্বকে উপন্যাসসমূহের ঘটনার কাল বলিয়া তিনি বাছিয়া লইয়াছিলেন। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (১৯০৪) -লেখকের পক্ষে ইহা একান্ত স্বাভাবিক। তখন আমাদের শিক্ষিত সমাজ ইংরেজি শিক্ষার প্রথম ধাক্কাটা সামলাইয়া লইয়াছে, তখন আর সভ্য হইবার দুরাশায় খৃস্টানধর্ম কেহ গ্রহণ করে না, বা ইংরেজিতে স্বপ্ন দেখিবার সংকল্পও পোষণ করে না। ইংরেজিতে সাহিত্য রচনা করিয়া যে অমরত্ব লাভ করিতে পারিবে বাঙালি লেখকগণ তখন সে আশাও পরিত্যাগ করিয়াছে। তখন আমাদের

সমাজের নেতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর। অক্ষয় দত্ত তখন বালির বাগানে বাস করিতেছেন। তখন বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় বিধবাবিবাহ-আইন পাশ হইয়া একটি-দুটি বিধবাবিবাহ হইতেছে। সে সময়ে হিন্দুসমাজের কোনো লোক কোনো সংস্কার বর্জন করিলেই সকলে তাহাকে ব্রাহ্ম বলিত। ওদিকে আবার বেথুন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির কৃপায় স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ ছড়াইয়া পড়িতেছে। তেমনি আবার ব্রাহ্মধর্মের প্রতিক্রিয়ায় একদল শিক্ষিত হিন্দু বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিয়া গিয়াছে। বাস্তবিকই সময়টা তখন যুগান্তর ছিল। বর্তমানে আমরা যেসব সুফল ও কুফল ভোগ করিতেছি তখন তাহাদের কারণ ঘটিতেছিল। এই সময়টাকে শিবনাথ ভালো করিয়া জানিতেন; প্রধানত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে জানিতেন, তিনি সেই সময়ের লোক। তাহা ছাড়া সেই যুগনাট্যের পাত্রপাত্রীর মধ্যে তিনিও অন্যতম ছিলেন, আর যেটুকু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় অজ্ঞাত ছিল, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজের লেখক হিসাবে তৎসম্বন্ধে তাঁহার পরোক্ষ জ্ঞানের অভাব ছিল না। এই সময়টাকে তিনি বাছিয়া লইয়াছিলেন, সকল লেখকই সুবিধামত সময় বাছিয়া লয়। কাজেই দেখিতে পাই তাঁহার সবগুলি উপন্যাসেই যুগান্তরের হাওয়া বহমান—

> ওদিকে বঙ্গদেশে মহা পরিবর্তনের দিন আসিতেছে। বঙ্গের সাহিত্যাকাশে ধুমকেতুর ন্যায় মধুসূদন উঠিয়াছেন। পাথুরিয়াঘাটার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও পাইকপাড়ার প্রতাপনারায়ণ সিংহ প্রভৃতি সমবেত হইয়া রঙ্গকাব্যের এক অদ্ভুত অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহাদের প্ররোচনায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁহার বিখ্যাত নাটকাবলী প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ত্বরায় তিলোত্তমা ও মেঘনাদবধ দেখা দিল।

বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিবৃত্তে এই ১৮৫৯ সাল চিরস্মরণীয়

বৎসর। ভক্তিভাজন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দুই বৎসর কাল পর্বতশৃঙ্গে তপস্যায় যাপন করিয়া ঋষিত্ব লাভ করিয়া এই বৎসরে বঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন এবং সেইসকল অগ্নিময় উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন, যাহা তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রতিভার চিরস্মরণীয় কীর্তিস্তম্ভরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। এমন দিন আসিবে, যখন সেগুলি বঙ্গভাষায় শ্রেষ্ঠ অলংকার বলিয়া সর্বত্র আদৃত হইবে। এই বৎসরেই খ্যাতনামা কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রাচীন দেবেন্দ্রনাথের সহিত তরুণ কেশবের সম্মেলনে নূতন বল আনিয়া দিল। উভয়ে একত্র হইয়া কলিকাতার যুবকগণকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। যুবকদলে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল; অনেক ব্রাহ্মণের সন্তান উপবীত ত্যাগ করিলেন, এবং নানাস্থানে যুবকগণ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের জন্য নিগ্রহ সহ্য করিতে লাগিল। এইসকল বিবরণ শুনিয়া একদিন নবীনচন্দ্র পঞ্চুকে বলিলেন— পঞ্চু, এইবার বুঝি সত্য সত্যই যুগান্তর ঘটিল। তোমার ব্রাহ্ম সমাজে ও বঙ্গদেশে বুঝি এইবার নবযুগ আসিল। —যুগান্তর

উমাকান্ত আসিয়াই তাঁহার আদর্শপুরুষ বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত তিনবার দেখা করিয়াছেন। অক্ষয়বাবু তখন গঙ্গার সন্নিকটস্থ বালী গ্রামে একটি উদ্যান রচনা করিয়া তন্মধ্যে বাস করিতেছিলেন। উমাকান্ত সেখানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন, একজন কৃতবিদ্য চিন্তাশীল উদারচেতা মানুষ জীবনের অবসানকাল কিরূপে যাপন করিতে পারে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যে তিন দিন আলাপ হইয়াছে সে তিন দিন সমুদায় কেবল নব নব জ্ঞানের কথাতে অতিবাহিত হইয়াছে।· ·তৎপরে দত্তজামহাশয় নিজের অর্ধলিখিত ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের উপক্রমণিকার কিছু কিছু পড়িয়া শুনাইয়াছেন।· ·গড়ের উপরে

অক্ষয়বাবুকে দেখিয়া তাঁহার আদর্শ, চিন্তাশীল পুরুষের ভাব বাড়িয়াছে বই কমে নাই ;· ·কিন্তু একটা বিষয়ে তাঁহার কিঞ্চিৎ ধোঁকা লাগিয়াছে। প্রথম সাক্ষাতের দিন অপরাপর কথার মধ্যে অক্ষয়বাবু বলিয়াছিলেন, আমি যখন বাহ্যবস্তু প্রভৃতি গ্রন্থ লিখি, তখন আমার যে জ্ঞান ছিল না, এখন সে জ্ঞান হইয়াছে, আমি দেখিতেছি যে, ইউরোপীয়দের ন্যায় মানসিক শ্রম করিতে হইলে আমাদিগকে ইউরোপীয়দের ন্যায় থাকিতে হইবে। —উমাকান্ত

আবার

অক্ষয়বাবু অপেক্ষা বিদ্যাসাগরমহাশয়ের সহিত উমাকান্তের ঘনিষ্ঠতা কিঞ্চিৎ অধিক হইয়াছে। বিদ্যাসাগরমহাশয় তখন তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ বহুবিবাহবিষয়ক গ্রন্থ লিখিবার আয়োজন করিতেছিলেন। —তদেব

অন্যত্র

উমাকান্ত রাজারামবাবুর সুপারিশপত্র লইয়া পাবলিক লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের নিকট পরিচিত হইয়াছেন এবং পাবলিক লাইব্রেরি হইতে পুস্তক আনিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন। —তদেব

পুনশ্চ

শ্যামাকান্ত কেবলমাত্র সভাতে বক্তৃতা করিয়া সন্তুষ্ট হন নাই, গীতার একটি নূতন এডিশন বাহির করেন, এবং 'বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম' নামে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করেন।· ·ইহার পরে তিনি নিজে এক বৈজ্ঞানিক টিকি রাখিলেন এবং বহুদিনের পরে কোশাকুশি লইয়া প্রতিদিন সন্ধ্যা-আহ্নিক আরম্ভ করিলেন। —তদেব

শিবনাথের উপন্যাসের আবহাওয়া বুঝিবার পক্ষে উদ্ধৃত অংশগুলি সাহায্য করিবে। উপরের অংশগুলিকে ইতিহাস বলা চলে ; এই ইতিহাস উপন্যাসকে কিভাবে সংক্রামিত বা প্রভাবিত করিয়াছে দেখা যাক।

এই ঐতিহাসিক যুগান্তরের প্রভাব শিক্ষিত সমাজের মনের উপরে বিচিত্র প্রতিক্রিয়ায় দেখা দিতেছিল। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি যে ব্রাহ্মসমাজের দিকে ঝুঁকিতেছিল এ কথা বলিলে যথেষ্ট বলা হয় না, কারণ নামতঃ ব্রাহ্ম না হইয়াও অনেকেই ব্রাহ্মসমাজের সমাজসংস্কারের ও জীবনসংস্কারের কার্যসূচী গ্রহণ করিতেছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ উমাকান্ত উপন্যাসের উমাকান্তকে লওয়া যাইতে পারে। সে গোঁড়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সন্তান, তাহাকে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত বলিবার উপায় নাই— কিন্তু সে এমন-এক অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যখন ব্রাহ্ম-পদ্ধতিতে মেয়ের বিবাহ দিয়াছে, আনুষ্ঠানিক ভাবে মাতৃশ্রাদ্ধ করে নাই এবং বিধবাবিবাহ-ব্যাপারে সাহায্য করিয়াছে। শেষের কাজটিতে পাই বিদ্যাসাগরের প্রভাব। উমাকান্ত বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিল। শিবনাথের উপন্যাসের আদর্শ চরিত্রগুলির অনেকেই উমাকান্তের ছাঁচে ঢালাই করা। নয়নতারা উপন্যাসের কালীপদ রায় এই ছাঁচে গড়া লোক। উমাকান্ত উপন্যাসের অন্যতম নায়ক নরেশ একটি অনুতপ্ত পতিতাকে বিবাহ করিয়াছে, এ-বিষয়ে উমাকান্ত তাহার প্রধান সহায়। আবার চারু, সেও উক্ত গ্রন্থের অন্যতম ব্যক্তি, একটি বিধবা বিবাহ করিয়াছে— বলা বাহুল্য উমাকান্ত তাহারও প্রধান সহায়। যেকালে দুর্গামোহন দাস আপন বিমাতার বিবাহের উদ্যোগী ছিলেন, খোদ শিবনাথ পঠদ্দশাতেই সহপাঠী যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের সহিত বিধবাবিবাহের কর্তা সাজিয়াছিলেন এবং অমিতকর্মী বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রাণপণ করিয়া বসিয়াছিলেন, সেকালের ঘটনা লিখিতে বসিলে ইহা ছাড়া আর উপায় কি? উপায় না থাকিলেও কাজটি বড় সহজ ছিল না; বাস্তবে তো বটেই, এমন কি উপন্যাসেও। শিবনাথের প্রথম উপন্যাস মেজ বৌ (১৮৮০), তাহাতে পাত্রপাত্রীর মধ্যে বিধবাবিবাহ ঘটাইবার ইচ্ছা থাকিলেও লেখক শেষপর্যন্ত যাইতে পারেন নাই। পরবর্তী

উপন্যাস যুগান্তরে ও উমাকান্তে এই ইচ্ছা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। উমাকান্তর উপরে অক্ষয় দত্তর প্রভাবের বিষয় আগেই উল্লেখ করিয়াছি।

সে সময়ে আর-একটি প্রভাব অনেকের মনে পড়িয়াছিল, সে হইতেছে জ্ঞানবাদের পরিণামজাত সংশয়বাদের প্রভাব। উমাকান্ত উপন্যাসের যে অন্যতম নায়ক নরেশের কথা এইমাত্র বলিলাম, তাহাকে প্রথমে দেখি সংশয়ীরূপে। সে সংশয়বাদ-ঘেঁষা শিক্ষিত লোক, আমিষ আহার করাই যে মানুষের পক্ষে প্রকৃতির বিধান ইহাই তাহার বিশ্বাস; পরিমিত সুরা পান এবং বাইনাচ দেখা অকর্তব্য নয়, ইহাও সে প্রমাণ করিতে চায়। এ-বিষয়ে বন্ধু উমাকান্তর সঙ্গে তাহার মতে মেলে না; অথচ সে নিজে সুরাপায়ী বা দুশ্চরিত্র নয়, সে গম্ভীর প্রকৃতির বিবেচনাশীল ব্যক্তি। নরেশ-চরিত্র তখনকার শিক্ষিত সমাজের একটি টাইপ, যেমন একটি টাইপ উমাকান্ত নিজে। আর-একটি টাইপ হইতেছে উমাকান্তর ভাই শ্যামাকান্ত, তাহার উল্লেখ করিয়াছি। সে বৈজ্ঞানিক হিন্দু, নিজে বৈজ্ঞানিক টিকি রাখিয়াছে, গীতার বৈজ্ঞানিক সংস্করণ বাহির করিয়াছে; রবীন্দ্রনাথ এই টাইপ-এর কথা স্মরণ করিয়াই লিখিয়াছিলেন—

পণ্ডিত ধীর, মুণ্ডিত শির,
প্রাচীনশাস্ত্রে শিক্ষা—
নবীন সভায় নব্য উপায়ে
দিবেন ধর্মদীক্ষা।
কহেন বোঝায়ে, কথাটি সোজা এ,
হিন্দুধর্ম সত্য—
মূলে আছে তার কেমিস্ট্রি আর
শুধু পদার্থতত্ত্ব।

টিকিটা যে রাখা, ওতে আছে ঢাকা
ম্যাগ্নেটিজ্‌ম্‌শক্তি,
তিলকরেখায় বৈদ্যুত ধায়
তাই জেগে ওঠে ভক্তি।

এটা বোধ করি শশধর তর্কচূড়ামণির প্রভাবের ফলে। শ্যামাকান্ত বৈজ্ঞানিক হিন্দু হইলেও, কিংবা খুব সম্ভব হইবার ফলেই, সুরা পান করে, বাইনাচ প্রভৃতি দেখে, প্রথমা পত্নী থাকিতেও দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়, সে নিয়মিত সন্ধ্যাহ্নিক করিয়া থাকে।

শিবনাথ স্পষ্টত নূতন হাওয়ার পক্ষপাতী। কিন্তু তাই বলিয়া প্রাচীন পন্থা বা প্রাচীনপন্থীগণের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার অভাব নাই। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের ইতিহাস স্মরণ করিলে মনে হইতে পারে যে, শ্রদ্ধার অভাব হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগরকে, শিবনাথের মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণকে এবং পিতা হরানন্দকে যে দেখিয়াছে, প্রাচীন পন্থার প্রতি তাহার অশ্রদ্ধা হইতেই পারে না। নয়নতারার বিদ্যার্ণব এবং উমাকান্ত উপন্যাসের রামগতি প্রাচীন পন্থার প্রতিনিধি, তাহাদের প্রতি পাঠকের যে শ্রদ্ধা জন্মে তাহার কারণ লেখকের নিজেরও শ্রদ্ধার অভাব ছিল না।

যুগান্তরের হাওয়ায় সমাজে যেমন নূতন টাইপ দেখা দিতেছিল তেমনি ঘটনাস্রোতও অপ্রত্যাশিত পথে চলিতেছিল। যুগান্তর উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ যে দ্বিখণ্ডিত হইয়া দুখানি স্বতন্ত্র উপন্যাসের সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছে তাহার কারণ ইহাই। এক দিকে নশিপুরের প্রাচীন সমাজ, আর-একদিকে কলিকাতায় নবীন সমাজ— নশিপুরের জীবনপ্রবাহ কলিকাতায় প্রবেশ করিয়া পূর্বতন পথচিহ্ন হারাইয়া ফেলিয়াছে। শিবনাথের সৃষ্টি আরও শক্তিসম্পন্ন হইলে তিনি এই দুই বিরুদ্ধমুখী

স্রোতের মধ্যে নৌকাকে ফেলিয়াও তাহাকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু যথাযথ শক্তির অভাবে তাহা হইয়া ওঠে নাই, নশিপুরের সুন্দর নৌকাখানি শেষপর্যন্ত বানচাল হইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের অভিযোগের কারণ নিহিত রহিয়াছে তখনকার সামাজিক হাওয়ার এলোমেলো গতির মধ্যে।

শিবনাথের উপন্যাসের আর্থিক কাঠামো স্মরণ করিলে মন ঈর্ষায় ভরিয়া ওঠে, ইহার উপরেও তৎকালের ছাপমারা। তখন কোনো রকমে একটা পাশ করিলেই চাকুরি জুটিত, পাশ করিতে না পারিলেও চাকুরির অভাব হইত না। উমাকান্ত পাশ-করা লোক নয়, গ্রামের পাঠশালায় পাঁচ টাকা বেতনে যাহার জীবনের সূত্রপাত তাহাকে দেখিতে পাই ছয় শত টাকা বেতনের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া পেনসন লইতেছে। তখন যে কেবল শহরে আসিলেই চাকুরি জুটিত এমন নয়, ম্যাজিস্ট্রেট সুদূর গ্রামে নিজের চাপরাশি পাঠাইয়া দিয়া উমেদারকে খুঁজিয়া বাহির করিত। শিবনাথের উপন্যাসে যা-কিছু দারিদ্র্য তাহা পল্লীসমাজে, শহরের সমাজে, অর্থাৎ শহরের শিক্ষিত সমাজে দারিদ্র্যের বড় চিহ্ন নাই, আর থাকিলেও তাহা ক্ষণিক, কারণ আজ যে দরিদ্র, কাল সকালবেলাকার গেজেটে তাহার চাকুরি ঘোষিত হইতে পারে, কিংবা তেমন বরাত-জোর থাকিলে ম্যাজিস্ট্রেটের চাপরাশি আসিয়াও দরজার কড়া নাড়িয়া উমেদারের ঘুম ভাঙাইতে পারে। কিন্তু অনেকদিন হইল সুলভ চাকুরির সে সত্যযুগ অপসৃত। এখন সেসব কথাকে অনেক পরিমাণে অবাস্তব মনে হয়।

৩

ঔপন্যাসিক শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রধান গুণ চরিত্রসৃষ্টিতে। চরিত্রসৃষ্টি দুই উপায়ে হইতে পারে— পর্যবেক্ষণশক্তির দ্বারা, আর কল্পনাশক্তির দ্বারা। দুইয়েরই জন্য প্রচুর সমবেদনার আবশ্যক। সমবেদনাজাত পর্যবেক্ষণশক্তির বলেই শিবনাথ চরিত্রসৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। এখানে জিজ্ঞাস্য, সমাজের কোন্ শ্রেণীর লোকের প্রতি তাঁহার সমবেদনা। যেসব নরনারী নূতন জীবনপন্থাকে সার্থকভাবে গ্রহণ করিতে পারিয়াছে তাহাদের প্রতি লেখক সহানুভূতিশীল, আবার যাহারা প্রাচীন পন্থাকে নিষ্ঠার সহিত আঁকড়িয়া রহিয়াছে তাহাদের প্রতিও লেখকের যথেষ্ট সহানুভূতি। কেবল যাহারা মধ্যবর্তী, নূতন শিক্ষাকেও গ্রহণ করিতে পারে নাই, আবার পুরাতন ধারাকেও পরিত্যাগ করিয়াছে, লেখক তাহাদের দেখিতে পারেন না। দৃষ্টান্তচ্ছলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যুগান্তরের বিশ্বনাথ তর্কভূষণকে ; নূতন ধারার সার্থক গ্রহীতাদের অনেকেরই নাম করা যায়। নূতন ধারার নরনারীর সঙ্গেই লেখকের সহানুভূতি স্বাভাবিক, কিন্তু প্রাচীন ধারার সার্থক গ্রহীতাগণও যে লেখকের সহানুভূতি হারায় নাই, তাহাতে দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শিবনাথের সুগভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়।

শিবনাথের অঙ্কিত নরনারীর মধ্যে নারীচরিত্রগুলিই অধিকতর বাস্তব ও সার্থক। ইহার প্রধান কারণ নারীচরিত্রে নিষ্ঠা ও আদর্শবাদ-প্রিয়তা স্বভাবসিদ্ধ। 'পতিদেবতা'-ভাবটির বাড়াবাড়ি হয়তো ভালো নয়। কিন্তু 'পতিদেবতা'-ভাবটিকে অবলম্বন করিয়াই এ দেশের নারী-সমাজ নিজেদের অন্তরের মধ্যে নিষ্ঠার চর্চা করিয়া আসিয়াছে। সেই নিষ্ঠা ঘটনাচক্রের অনুরোধে যে ভাবটিকে গ্রহণ করিয়াছে তাহাকেই আঁকড়িয়া ধরিয়াছে, সেই ভাবটিই নারীর চরিত্রে 'পতিদেবতা'র

বিকল্প হইয়া সজীব হইয়া তাহাকে এমন একপ্রকার দৃঢ়তা দিয়াছে, পুরুষচরিত্রে যাহার অনুরূপ পাওয়া দুষ্কর। উদাহরণস্থল নয়নতারা। নয়নতারা নূতন ধারার অন্তর্গত নারীচরিত্র। তাহার আচরণ ও কথা-বার্তায় কোথাও কোথাও নীতিগ্রন্থের গন্ধ থাকিলেও— শিবনাথের উপন্যাসে অনেকস্থলেই ইহার দৃষ্টান্ত মিলিবে— সে একান্ত সজীব ও বাস্তব। শেষপর্যন্ত তাহার বিবাহ যখন ভাঙিয়া গেল, সে নিজে ভাঙিয়া পড়িল না ; মহত্তর জীবনের আদর্শকে অপ্রাপ্য প্রণয়ীর আদর্শরূপের সহিত মিলাইয়া লইয়া একক জীবন যাপন করিতে সে বদ্ধপরিকর হইল। তাহার দুঃখে পাঠকের সহানুভূতি হয়, আবার তাহার নিষ্ঠা দেখিয়া তাহার প্রতি শ্রদ্ধাও জন্মে।

শিশু- ও বালকবালিকা- চরিত্র অঙ্কনেও লেখকের কৃতিত্ব অসাধারণ। এত বালকবালিকার চরিত্রসৃষ্টি অল্প বাঙালি লেখকই করিয়াছেন। ইহারা নবীন ও প্রাচীন দুই ধারারই বাহিরে ; কোনো বিশেষ মতের অনুরোধে নয়, কেবল মানবচরিত্রের আকর্ষণেই সার্থক বালকবালিকার চরিত্র সৃষ্টি করা যায়।

শিবনাথের আর-একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহার সহানুভূতি কেবল মানবসমাজের মধ্যেই আবদ্ধ নয়, পশুপাখির প্রতিও তাঁহার দরদ গভীর। কুকুর বিড়াল খরগোস টিয়া ময়না হরিণ প্রভৃতি গৃহপালিত পশুপক্ষীকে এমন সহৃদয়তার সহিত দেখিয়াছেন যে তেমন আর-কোনো বাংলা লেখকের রচনায় দেখিতে পাই না। তাঁহার সমবেদনাগুণের সহকারী গুণ হাস্যরস। হাস্যরসের চকমকি ঠুকিতে ঠুকিতে তিনি সংসারপথে অগ্রসর হইয়াছেন— তাহাতে পথের দূরত্ব কমে নাই বটে, কিন্তু পথ চলার কাজটা অনেক সহজ হইয়াছে।

ঔপন্যাসিক হিসাবে শিবনাথের প্রধান ত্রুটি এই যে চরিত্র-অঙ্কন-ক্ষমতা তাঁহার যেমন প্রচুর, গল্প-গ্রন্থন বা প্লট-সৃষ্টির ক্ষমতা তেমনি অল্প,

সেদিকে তাঁহার যেন দৃষ্টিই নাই। অনেক সময়েই গল্পের মূলধারাকে ফেলিয়া রাখিয়া তিনি চরিত্রব্যাখ্যা, নয় মতপ্রতিষ্ঠা করিতে বসেন। এই রকম একটি অনবধানতার সুযোগেই যুগান্তর-কাহিনী দ্বিখণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার কাহিনী নরনারীর চরিত্রবেগে অগ্রসর হইতে জানে না, তাই লেখককে অগ্রসর হইয়া আসিয়া মতবাদের শুষ্ক-ডাঙায়-ঠেকিয়া-যাওয়া কাহিনীকে ঠেলিয়া অগ্রসর করিয়া দিতে হয়; তবে সব সময়েই যে এমন ঘটিয়াছে তাহা নয়।

আর-একটি ত্রুটি, যেসব ঘটনার বিবরণ তিনি শুনিয়াছেন বা যেসব বাস্তব লোক দেখিয়াছেন তাহাদের অনেকগুলিকেই শিল্পসম্মত উপায়ে সংশোধিত করিয়া না লইয়াই কাহিনীর অন্তর্গত করিয়া দিয়াছেন। এমন প্রক্রিয়া ইতিহাসরচনায় চলিতে পারে, উপন্যাসরচনায় চলা উচিত নয়। প্রসঙ্গক্রমে শিবনাথের রচনা সম্বন্ধে সবচেয়ে গুরুতর প্রশ্নটিতে আসিয়া পড়িলাম। শিবনাথ স্বভাবত ঐতিহাসিক, ঔপন্যাসিক নহেন। উনবিংশ শতকের বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাস রচয়িতাদের মধ্যে আমি তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি। তাঁহার উপন্যাসগুলিও নামান্তরে সামাজিক ইতিহাস। এগুলিতে ঔপন্যাসিকের ও ঐতিহাসিকের যুগল দায়িত্ব পালন করিতে গিয়া তাঁহার লেখনী দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছে। তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজে ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব না থাকায় তাহা স্বাধীনভাবে স্বকার্যসাধন করিতে পারিয়াছে। আর যে চরিত্রসৃষ্টির ক্ষমতা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ, যে হাস্যরস তাঁহার সহজাত, সে দুটি গুণও উক্ত গ্রন্থে কাজে লাগিয়া গিয়া এমন-এক একনিষ্ঠ সার্থকতা লাভ করিয়াছে, উপন্যাসে যাহা বিরল।

তাঁহার সবগুলি উপন্যাসই রামতনু লাহিড়ীর আগে লিখিত। বিধবার ছেলে ও তাহার বিকল্প উমাকান্ত পরে প্রকাশিত হইলেও লিখিত হইয়াছে আগে। তাই মনে হয় যে তাঁহার সামাজিক উপন্যাসগুলি

তাঁহার সামাজিক ইতিহাসের খসড়া। সেই কারণেই বোধ করি সামাজিক ইতিহাসখানা লিখিবার পরে তিনি আর সামাজিক উপন্যাস লিখিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। কাহিনী ও ইতিহাসের জোড় মিলাইবার বৃথা চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া নিছক ইতিহাসরচনায় তিনি শ্রেষ্ঠ চরিতার্থতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তখন তাঁহার কলম আর উপন্যাসরচনার পথে ফিরিতে চাহে নাই। ঔপন্যাসিক শিবনাথের শ্রেষ্ঠ রচনা রামতনু লাহিড়ী— ইতিহাসের তথ্য ও কল্পনার সত্য মিলিত হইয়া ইহাকে বাংলা সাহিত্যের একখানা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থে পরিণত করিয়াছে।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

১৮৪৭ - ১৯১৯

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের বিস্মৃতপ্রায় লেখক। বড়ই বিস্ময়ের কথা। বসুমতী গ্রন্থাবলী-সিরিজ ব্যতীত তাঁহার গ্রন্থ বাজারে পাওয়া যায় না।[১] বসুমতী গ্রন্থাবলীও সম্পূর্ণ নহে। তাঁহার ইংরেজি রচনা ভারতীয় শিল্পের পরিচয়-গ্রন্থাবলী বোধ করি দুষ্প্রাপ্য হইয়া গিয়াছে। ত্রৈলোক্যনাথের কঙ্কাবতী গ্রন্থখানার কথা কোনো কোনো পাঠকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। তবে সে অনেকটা কিংবদন্তীর মত, পঠিত-অভিজ্ঞতা বলিয়া মনে হয় না। বাংলা সাহিত্যের একজন major বা মহৎ লেখকের এমন অবলুপ্তি যুগপৎ দুঃখ ও বিস্ময়ের হেতু।

ত্রৈলোক্যনাথ বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গসাহিত্যিক বা satirist। সৌভাগ্যের বিষয়, বাংলা সাহিত্যে স্যাটায়ার বা স্যাটায়ারিস্টের অভাব নাই। মাইকেল হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অধিকাংশ বাংলা সাহিত্যিকের রচনায় কিছু-না-কিছু স্যাটায়ার আছে, কিন্তু কেহই বিশুদ্ধ ও নিছক ব্যঙ্গরচনায় আত্মনিয়োগ করেন নাই। তাঁহাদের দৃষ্টি ব্যঙ্গ-সাহিত্যিকের দৃষ্টি নয়; ব্যঙ্গসাহিত্যিক যে-দৃষ্টিতে জীবনকে দেখিয়া থাকেন সে-দৃষ্টিতে তাঁহারা অভ্যস্ত নন, সে-দৃষ্টি তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ নয়। ত্রৈলোক্যনাথ ব্যঙ্গের বক্রদৃষ্টি লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; বিশুদ্ধ ও নিছক ব্যঙ্গরচনাতেই তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

এখন একজন বিস্মৃতপ্রায় লেখকের পক্ষ হইতে এত বড় দাবির

১ সম্প্রতি শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় 'কঙ্কাবতী' পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছে।

উত্থাপন অনেকের কাছেই বিস্ময়কর লাগিতে পারে ; কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে স্মৃতি ও বিস্মৃতি, খ্যাতি ও অবলুপ্তি বিচারের অপেক্ষা রুচির উপরেই বেশি নির্ভর করে ; আর রুচির ন্যায় পিচ্ছিল ও চঞ্চল বৃত্তি অল্পই আছে, কাজেই ত্রৈলোক্যনাথের অবলুপ্তিতে বিস্মিত না হইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হওয়াই উচিত। বিচারান্তে যদি প্রমাণ হয় আমরা তাঁহার পক্ষ হইতে যে দাবি উত্থাপন করিলাম তাহা সত্য, তবে প্রসন্নমনে বাংলা সাহিত্যের ব্যঙ্গরচনার শ্রেষ্ঠ আসনখানি তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়াই সংগত। রচনার পরিমাণ ও গুণ এই দুই দিকের বিচারেই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইবে। কিন্তু তদপেক্ষা বড় কথা এই যে, ব্যঙ্গশিল্পীর সম্পূর্ণ সহজাত বক্রদৃষ্টি লইয়াই ত্রৈলোক্যনাথ জন্মিয়াছিলেন, এই দৃষ্টির সম্পূর্ণতার অধিকারী বাংলা সাহিত্যে তিনি একাই। অপর যাঁহারা ব্যঙ্গরচনা করিয়াছেন, ব্যঙ্গ তাঁহাদের পক্ষে অধিকাংশক্ষেত্রেই *tour de force*, স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপার নহে।

ত্রৈলোক্যনাথের জীবনের ঘটনা ও ভাবনার ধারা না বুঝিলে তাঁহার সাহিত্য বোঝা দুর্ঘট হইবে। তাঁহার বাল্যকালের ও প্রথমযৌবনের দুঃখদারিদ্র্য, সেই দুঃখদারিদ্র্যের প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁহার মনুষ্যত্ব, অপরের দুঃখদুর্দশার প্রতি তাঁহার সমবেদনাপূর্ণ আত্মীয়তা— এ সমস্তই একাধারে তাঁহার জীবনের ও সাহিত্যের উপকরণ। একটিকে জানিলে তবে অপরটি বুঝিয়া ওঠা সহজ। তার পরে কর্মজীবনে দেশের সর্বব্যাপী দারিদ্র্য ও অসহায় ভাব দেখিয়া তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন— যেমন করিয়া পারেন, আমৃত্যু দেশের দুঃখ দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন। তাঁহার কর্মজীবন, দেশীয় শিল্প প্রসারের প্রয়াস, দেশীয় শিল্পের ইতিহাস রচনা, পরিণত বয়সে আজন্মের সংস্কারের বিরুদ্ধে বিলাতযাত্রা— সমস্তই এই প্রতিজ্ঞা রক্ষার অংশ। কর্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণের পরে পূর্বতন ভাবে প্রতিজ্ঞা রক্ষার উপায় ছিল না, তখন প্রতিজ্ঞা রক্ষার

নিমিত্ত তিনি সাহিত্যস্থষ্টিতে আত্মনিয়োগ করিলেন। তাঁহার রচনা তাঁহার জীবনকর্মেরই একটা প্রক্ষেপ মাত্র, তাঁহার অবসরজীবন তাঁহার কর্মজীবনের রূপান্তর ছাড়া আর কিছুই নয়। কর্মে ও অবসরে, ঘটনায় ও ভাবনায় এ রকম একপ্রতিজ্ঞ ব্যক্তি বাংলাদেশে সত্যই বিরল। ব্যক্তিত্বের বিচারে শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, বাংলাদেশেও তাঁহার মত নিষ্ঠাসম্পন্ন মানুষ খুব বেশি জন্মগ্রহণ করেন নাই।

এখন হইতে এক শতাব্দী পূর্বে, ১২৫৪ (১৮৪৭) সালের ৬ শ্রাবণ, ত্রৈলোক্যনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের সাংসারিক অবস্থা অস্বচ্ছল ছিল। কতকটা সেই কারণে, কতকটা সেকালের নূতন-আমদানি ম্যালেরিয়ার জন্য, আর অল্প বয়সেই পিতার লোকান্তরপ্রাপ্তির ফলে তাঁহার ইস্কুলের লেখাপড়া অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। অল্প বয়সেই তাঁহাকে বিদ্যালয়-জাত জ্ঞানলাভের আশা পরিত্যাগ করিয়া বৃহত্তর নিরুদ্দেশ সংসারে বাহির হইয়া পড়িতে হয়। তখন হইতে অজানা পৃথিবীর অনাত্মীয় পথঘাটই তাঁহার প্রকৃত বিদ্যালয় হইয়া উঠিল।

১৮৬৫ সালে পদব্রজে তিনি মানভূম-পুরুলিয়া যাত্রা করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স আঠারোর বেশি নহে। পথের কষ্ট অবর্ণনীয়। তার পরে ১৮৬৮ সালে তিনি কটক জেলায় পুলিশ-দারোগার সরকারি চাকুরিতে প্রবেশ করিলেন। মাঝখানের তিন বৎসর তাঁহার জীবনের দুর্বহ দুঃখকষ্ট ও খণ্ডিত চাকুরির ইতিহাস। এই তিন বৎসরে তিনি বীরভূমের দুইটি ইস্কুলে আর পাবনা জেলার সাজাদপুরের একটি ইস্কুলে শিক্ষকতা করেন।

এই তিন বৎসর পথে-ঘাটে যে দুঃখকষ্ট তিনি পাইয়াছেন তাহার প্রধান কারণ তাঁহার অনমনীয় আত্মসম্মানবোধ। দীর্ঘ বিদেশযাত্রায় বাহির হইতেছেন, হাতে একটিও পয়সা নাই, অথচ পরমাত্মীয়ের

নিকটেও টাকাপয়সা চাহিবেন না। এমন লোকের পক্ষে অপরিচিত স্থানে ক্লেশ ছাড়া আর কি জুটিবে।

ত্রৈলোক্যনাথ লিখিতেছেন—

আমার একটি আত্মীয় শ্রীযুক্ত হরকালী মুখোপাধ্যায় সেই সময়ে বর্ধমানে থাকিতেন। তিনি ডেপুটি-ইন্সপেক্‌টার অব্‌ স্কুলের কাজ করিতেন। স্কুল-মাস্টারির প্রার্থনায় তাঁহার নিকট গেলাম। প্রথমে তিনি কাটোয়ায় পাঠাইলেন, সেথায় কিছু হইল না। পরে বীরভূম জেলায় কীর্ণাহার নামক স্থানে পাঠাইলেন ; সেখানেও হইল না। পরে তাঁহার কথায় রামপুরহাটে গেলাম, সেখানেও বিফলমনোরথ হইলাম। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনকালে কপর্দকশূন্য অবস্থায় থাকিতাম, আত্মীয় হরকালী মুখোপাধ্যায়ের নিকট প্রার্থনা করিলে অবশ্য তিনি কিছু দিতেন, কিন্তু চাইতে পারিতাম না। লোকের বাটীতে অতিথি হইয়া পথ চলিতাম।

রামপুরহাট হইতে পদব্রজে শিউড়ি ফিরিয়া আসিয়া বর্ধমানের দিকে চলিলাম। পাঁচ-ছয় ক্রোশ দূর গিয়া আর চলিতে পারিলাম না। নিতান্ত ক্লান্ত ও দুর্বল হইয়া পড়িলাম। অতি কষ্টে একখানি গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলাম। এক ব্যক্তির বাটীতে স্ত্রী-পুরুষের কাপড়ে চুন-হলুদ দেখিতে পাইলাম। মনে করিলাম, ইহাদের বাড়িতে কোনোরূপ শুভকার্য হইয়াছে, ইহাদের বাড়িতে খাইতে পাইব। তাহারা জাতিতে সদ্‌গোপ। বাটীর কর্তা বৃদ্ধ। বৃদ্ধের নিকট আমার সমুদয় দুঃখের কথা বলিলাম। অতি সমাদর করিয়া বৃদ্ধ আমাকে মুড়ি, গুড় ও ঘোল খাইতে দিল। অমৃতের অপেক্ষা তাহা আমাকে মিষ্ট লাগিল। দেহ আমার পুনর্জীবিত হইল। পুনরায় বর্ধমান অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

এ রকম অভিজ্ঞতা তাঁহার প্রথমজীবনে অবিরল। বাল্যকালে

তিনি দরিদ্র ছিলেন, দুরন্ত ছিলেন; কিন্তু সেই সঙ্গে ছিল তাঁহার বিদ্যাসাগরী প্রচণ্ড আত্মসম্মানবোধ। এই শেষোক্ত গুণটি তাঁহার চরিত্রে অতিমাত্রায় না থাকিলে শেষপর্যন্ত তিনি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিতেন কি না সন্দেহ।

আর-একবারের কথা। ত্রৈলোক্যনাথ লিখিতেছেন—

> সন্ধ্যাবেলা আমি মেমারি আসিয়া পঁহুছিলাম। মেমারি স্টেশনের পুষ্করিণীর শানবাঁধা ঘাটে পড়িয়া রহিলাম; ভাবিতে লাগিলাম, দুদিন আহার হয় নাই; অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি; যদি আজ রাত্রেও অনাহারে এখানে শুইয়া থাকি তো কাল প্রাতে আরও দুর্বল হইয়া পড়িব, সুতরাং এখনি পথ চলা ভালো। রাত্রিতেই পথ চলিতে লাগিলাম। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় পা আর উঠে না, একটা তেঁতুলগাছ হইতে তেঁতুলপাতা পাড়িয়া লইলাম। তাহাই চিবাইতে চিবাইতে পরদিন বেলা বারোটার সময় মগরায় আসিলাম। শরীর অবসন্ন, আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। একটি পুরাতন ছাতা ছিল। একজন দোকানী সেই ছাতাটি বাঁধা রাখিয়া আমাকে ফলাহার করিতে দিল, আর গঙ্গা পার হইবার নিমিত্ত নগদ একটি পয়সা দিল। আমি বাটী আসিলাম।

ত্রৈলোক্যনাথের প্রথমজীবন এইরূপ শোচনীয় অভিজ্ঞতায় পূর্ণ—কিন্তু কখনোই তিনি আত্মসম্মানবোধ বিসর্জন দেন নাই।

ইহার পরে যখন তিনি উখড়ায় দ্বিতীয়-শিক্ষকের কার্য করিতেছেন, তখন সেখানে এক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ক্ষুধার কঙ্কালসার মূর্তি চারি দিকে। অপরের ক্ষুধার সঙ্গে নিজের ক্ষুধাও মিশিল। দেশের শিশুভাইদের জন্য টাকা বাঁচাইতে গিয়া অনেক দিনই তাঁহাকে একান্ন, কখনো-কখনো বা সারাদিন অনাহারে থাকিতে হইত। ক্ষুধায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হইলে শীতল জল পান করিয়া শরীর কিঞ্চিৎ সুস্থ করিতেন।

সেই সময়ে দ্বিবিধ ক্ষুধার অশ্রু-সরস্বতীর তীরে বসিয়া তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন—

যাহাতে এই স্বর্ণভূমি ভারতভূমিতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত না হইতে পারে, এইরূপ কার্যে আমার মনকে আমি নিয়োজিত করিব। সেই দিন হইতে এই সম্বন্ধে যাহা-কিছু শিখিবার আবশ্যক শিখিতে লাগিলাম। তখন মনে মনে এই স্থির হইয়াছে যে, ভারতের লোক যদি নিজে নিজে একটু যত্ন করে, তাহা হইলে এ দেশের অন্তত অর্ধেক দুঃখও দূর হইতে পারে। আজ পর্যন্ত এই বিষয়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের চক্ষু উন্মীলিত করিতে যত্ন পাইতেছি। কিন্তু কি করিব, সকলেই আপনার নিজের স্বার্থের জন্য ব্যস্ত। যাহাতে দেশের দুঃখমোচন হয়, এরূপ চিন্তা অল্প লোকেই করিয়া থাকেন; বড়জোর নাহয় ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষে কতকগুলি লোককে বৎসরের মধ্যে এক দিন কি দুই দিন আহার দিয়া থাকেন। কিন্তু গরীবদুঃখী লোকেরা চিরকালের জন্য যাহাতে এক মুঠা অন্ন পায়, এরূপ কার্যে কয়জনের দৃষ্টি আছে?

ত্রৈলোক্যনাথের এই প্রতিজ্ঞাই তাঁহার জীবন ও সাহিত্যের মেরুদণ্ড। তাঁহার কর্মজীবন ও সাহিত্যজীবনকে এই একটি মেরুদণ্ডই বিধৃত করিয়া রাখিয়াছে। কর্মের দ্বারা যতদিন সম্ভব এই প্রতিজ্ঞা-পালনে তিনি তৎপর ছিলেন, কর্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সাহিত্যসৃষ্টির দ্বারা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই প্রতিজ্ঞা-পালনে নিযুক্ত ছিলেন। কাজেই তাঁহার সাহিত্য বুঝিবার পক্ষে তাঁহার প্রতিজ্ঞা, এবং প্রতিজ্ঞার পটভূমিস্বরূপ তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতা প্রথমে বুঝিয়া লওয়া একান্ত আবশ্যক বলিয়াই এত বিস্তারিতভাবে তাঁহার জীবনের এই অংশটিকে ব্যাখ্যা করিতে হইল।

সরকারি চাকুরিতে ঢুকিয়া ত্রৈলোক্যনাথ দুইজন উদার ও উন্নতমনা ইংরেজের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা স্যর উইলিয়াম

হাণ্টার ও স্যর এডওয়ার্ড বক্। ইঁহাদের সাহায্যে ও নিজের কর্ম-কুশলতায় তিনি ক্রমে ক্রমে গবর্মেণ্টের স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্ ও কৃষিবাণিজ্য বিভাগে দায়িত্বসম্পন্ন পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। কিন্তু সর্বদাই তিনি নিজের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ রাখিতেন। এই সময়ে দেশের শিল্পপ্রসারের জন্য তিনি একটি কাজ করিয়াছিলেন। বড় বড় রেল-স্টেশনে ও হোটেলে দেশীয় শিল্পবস্তু রাখিয়া বিক্রয় করিবার যে ব্যবস্থা এখন চলিত আছে তাহা তাঁহারই প্রবর্তিত। ১৮৭৭-৭৮ সালে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। গাজরের চাষ করিয়া তদ্দ্বারা লোকের প্রাণরক্ষা করা যাইতে পারে, তিনি গবর্মেণ্টকে এই প্রস্তাবটি দেন। তাঁহার প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ হওয়াতে বহু সহস্র লোকের প্রাণ বাঁচিয়া যায়। অতঃপর তিনি রাজস্ববিভাগে বদলি হন।

১৮৮৬ সালে বিলাতে শিল্পপ্রদর্শনী আরম্ভ হয়। দেশীয় শিল্পপ্রসারে কিয়ৎপরিমাণে সাহায্য করিতে পারিবেন এই ভরসায় তিনি সামাজিক সংস্কারের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বিলাতযাত্রা করেন। এই ভ্রমণবৃত্তান্ত তাঁহার *Visit to Europe* গ্রন্থে লিখিত আছে।

সরকারি চাকুরির শেষ কয়েক বছর তিনি কলিকাতা মিউজিয়ামের সহকারী কিউরেটারের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ায় তিনি ১৮৯৬ সালে পেনসন লন।

১৯১৯এর নভেম্বর মাসে ৭৩ বৎসর বয়সে পুরীতে তিনি দেহত্যাগ করেন।

তাঁহার প্রকৃত সাহিত্যজীবন সরকারি চাকুরি হইতে অবসর লইবার পরেই আরম্ভ হয়।

ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী দ্বিভাষিক, ইংরেজি ও বাংলা।

ইংরেজি গ্রন্থগুলি ভারতীয় শিল্প, কৃষিজাত দ্রব্যাদির বর্ণনা ও ইতিহাস। তাঁহার বাংলা রচনাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়:

স্কুলপাঠ্য বিজ্ঞান ও নীতিবিষয়ক গ্রন্থ ; তিনি ও তাঁহার অগ্রজ একযোগে বিশ্বকোষ নামে অভিধানগ্রন্থ-রচনার সূত্রপাত করেন ; তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে তাঁহার রচিত সাহিত্য-গ্রন্থাবলী।

বর্তমান প্রবন্ধে তাঁহার সাহিত্য-গ্রন্থাবলীই প্রধান আলোচ্য বিষয় হইলেও উল্লেখ করা যাইতে পারে তাঁহার ইংরেজি ও বাংলা সমুদয় গ্রন্থই একই ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত— দেশের কল্যাণসাধন। তাঁহার প্রথমজীবনের প্রতিজ্ঞার কথা কি ভাবে তিনি বিস্মৃত হইবেন ?

২

স্যাটায়ার বা ব্যঙ্গ উদ্দেশ্যমূলক শিল্প, অন্য শ্রেণীর সহিত ইহার প্রভেদ এইখানে। অন্য শিল্পের মৌলিক প্রেরণা যাহাই হোক, মূলটা গুপ্ত থাকে ; কিন্তু ব্যঙ্গের মূলটা যে শুধু মুখ্য তাহাই নয়, মূলটাকে অনেক সময়েই গোপন রাখা চলে না। উপমার ভাষায় ব্যঙ্গ যেন মূলা ; মূলটাই এখানে মুখ্য, সমস্ত গাছের লক্ষ্য ওই মূলটাকে পুষ্ট করিয়া তোলা। ইহাই ব্যঙ্গের প্রধান গুণ, আবার এইখানেই তাহার গুণের সীমা। ব্যঙ্গ অত্যুচ্চ শ্রেণীর সহিত্য, কিন্তু কোনো মতেই উচ্চতম শ্রেণীর সাহিত্যে গণ্য হইতে পারে না।

ব্যঙ্গ উদ্দেশ্যমূলক শিল্প, অর্থাৎ ইহাকে একপ্রকার প্রচারসাহিত্য বলা যাইতে পারে। মনুষ্যত্বের অনুকূলে ব্যঙ্গ চিরকাল প্রচারকার্য চালাইয়া যাইতেছে। কিন্তু মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। যে লোকটা স্বেচ্ছাকৃত নকিব হইয়া তারস্বরে তাহার পক্ষে প্রচারকার্য চালাইতেছে তাহাকে দ্বারের কাছেই রাখিয়া দেয়, আর যে-কবিতা তাহার কানে-কানে স্বর্গীয় প্রলাপ-বাণী ঢালিতে থাকে, সাংসারিক প্রয়োজনসাধনে যে-প্রলাপের কিছুমাত্র উপকারিতা নাই, সেই স্বর্গীয় প্রলাপবাদিনীকে অন্তঃপুরের গোপন কক্ষে

লইয়া গিয়া আদর করিয়া বসায়। সকল দেশে সকল কালেই কবিতার স্থান ব্যঙ্গের অনেক ঊর্ধ্বে।

ব্যঙ্গসাহিত্যিকগণ তাঁহাদের শিল্পের এই ন্যূনতার কথা জানেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের তেমন ভ্রূক্ষেপ নাই। তাঁহারা প্রধানত সংসারের মঙ্গলসাধন করিতে চান। মূলত তাঁহারা কর্মী, কিন্তু কর্মের একটা স্বাভাবিক সীমা আছে বলিয়াই যেন শিল্পের মাধ্যমে তাঁহাদের কর্মপ্রবণ চিত্ত আপনাকে প্রকাশ করিতে থাকে। ব্যঙ্গশিল্প সাহিত্যিকের কর্ম-শক্তিরই যেন একটা প্রক্ষেপ। এইজন্যই দেখা যায়, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গসাহিত্যিকদের অনেকেই কর্মকুশলী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাদের সমস্ত ইচ্ছা কর্মের মাধ্যমে প্রকাশিত হইবার সুযোগ পাইলে হয়তো তাঁহারা আর শিল্পমাধ্যমের প্রয়োগে অগ্রসর হইতেন না। আপাতত ভল্‌টেয়ার ও সুইফ্‌টের নাম মনে পড়িতেছে। ভল্‌টেয়ারের মত কর্মকুশলতা খুব অল্প সাহিত্যিকের ভাগ্যেই ঘটিয়াছে। শুধু সাহিত্যিক কেন, ব্যবসায়ীদের মধ্যেও তাঁহার জুড়ি মেলা সহজ নয়। পরবর্তী কালে ধনোপার্জনে ও ব্যবসায়ে মধ্যবিত্তশ্রেণী যে সার্থক প্রবণতা দেখাইয়াছে, ভল্‌টেয়ার তাহার আদর্শস্থল। তাঁহাকে প্রথম সার্থক মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী বলা যাইতে পারে। অর্থোপার্জনে তাঁহার যে কেবল কুশলতা ছিল তাহা নয়, পন্থার ভালোমন্দ বিচারেরও অভাব তাঁহার ছিল। তৎকালে যুদ্ধের বাজারে টাকা খাটাইয়া, সব সময়ে সদুপায়ে নয়, তিনি প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এবারের যুদ্ধের বাজারের সদ্ব্যবহার করিতে পারিলেন না বলিয়া খুব সম্ভবত তাঁহার মধ্যেকার ব্যবসায়ীটা পরলোকে বসিয়া বুক চাপড়াইয়া মরিতেছে। ভল্‌টেয়ারের আর্থিক-দুর্নীতিপরায়ণতার উল্লেখের জন্য এ প্রস্তাবের অবতারণা নয়, তাঁহার কর্মকুশলতার বর্ণনার জন্য মাত্র। সংকীর্ণতর ক্ষেত্রে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় যে কর্মীপুরুষ ছিলেন তাঁহার জীবনীপ্রসঙ্গে তাহা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি।

ব্যঙ্গশিল্পের উদ্ভবের কারণ কি ? সময়ের গুণ ও ব্যক্তির বিশেষগুণের সমন্বয়ের ফলেই ব্যঙ্গশিল্পের, তথা সমস্ত শিল্পেরই, উদ্ভব হইয়া থাকে। মানুষের সমাজে এক-একটা যুগ আসে, ব্যঙ্গরচনার যাহা অনুকূল। ইউরোপের অষ্টাদশ শতক ছিল এইরকম একটা যুগ। এই যুগাধিনায়ক ছিলেন ভল্‌টেয়ার ও সুইফ্‌ট্‌। সে যুগে কবির অভাব ছিল না, কিন্তু ব্যঙ্গই ছিল তখনকার প্রধান শিল্প। ব্যঙ্গ এবং ইতিহাস। এ দুই যতই ভিন্নশাখাশ্রয়ী হোক-না কেন, এক জায়গায় মিল আছে। দুইয়েরই অন্যতম মূল উপাদান সংশয় ও নাস্তিক্য। আধুনিক ইউরোপের শ্রেষ্ঠ স্যাটায়ার ও শ্রেষ্ঠ ইতিহাস একই শাখার ফল, একই রসে পুষ্ট। বাংলা সাহিত্যের অষ্টাদশ শতকের সঙ্গে ওদেশের অষ্টাদশ শতকের কার্যকারণের ঐক্য থাকা সম্ভব নয়, তৎসত্ত্বেও দেখি অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি ভারতচন্দ্র ছিলেন উঁচুদরের ব্যঙ্গলেখক। এ কেমন করিয়া হইল ? তখন সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া কি একই হাওয়া বহিতেছিল ?

এ যেমন গেল যুগের গুণ, তেমনি বিশিষ্ট ব্যক্তির গুণ আছে। সংসার ভালোয়-মন্দয় জড়িত। কোনো-কোনো লেখকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় স্বভাবতই ভালোর দিকে, কাহারও আবার মন্দর দিকে। সংসারের ভালো দেখিয়া কেহ বা উল্লসিত হন, মন্দটা দেখিয়া কেহ বা ক্ষিপ্ত হইয়া ওঠেন। আর ভালো-মন্দকে সমান ভাবে দেখিবার সৌভাগ্য ও শক্তি মানুষের কদাচিৎ দেখা যায়, যে দেখিতে পারে সে শেক্‌স্‌পীয়ার হয়।

বুঝিলাম যে বিশিষ্ট কালগুণ আছে, আবার বিশিষ্ট ব্যক্তিগুণ আছে। কিন্তু এই দুইয়ের সমন্বয় হয় কিরূপে ? কাকতালীয় না কার্যকারণসম্ভূত ? ভালো-মন্দ সব সময়েই আছে, তবে এক-একটা সময়ে এক-একটা দিক উগ্রতর হইয়া ওঠে, আর এমন হইবার পিছনে পূর্বগামী অনেক কার্যকারণের ধাক্কা থাকে। সাধারণত দেখা যায়, কোনো-একটা মহৎ আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত যুগের অবসানকালই ব্যঙ্গের প্রাদুর্ভাবের সময়।

রেনেসাঁসের ক্ষয়িত প্রভাবের যুগে ভল্‌টেয়ার, বৈষ্ণব সাহিত্যের উন্মাদনার পরে বিদ্যাসুন্দর; বিদ্যাসুন্দর রাধাকৃষ্ণের প্রচ্ছন্ন স্যাটায়ার মাত্র।

জগতের কল্যাণরূপ যেসব শিল্পীর চোখে পড়ে তাহারা জগতের কবিশ্রেষ্ঠ হয়। গ্যেটে আছেন, রবীন্দ্রনাথ আছেন, ইঁহারা কখনো-কখনো স্যাটায়ার-রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু তেমন সাফল্য-লাভ করিতে পারেন নাই, দৃষ্টিভঙ্গী ও যুগধর্ম দুইই প্রতিকূল। শেলি ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ একই কারণে বারংবার ব্যর্থকাম হইয়াছেন।

ভল্‌টেয়ার তৎকালীন ধর্মান্ধতা ও বুদ্ধির মূঢ়তা দেখিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া তীক্ষ্ণোজ্জ্বল ব্যঙ্গ-পুস্তিকার বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহার হাসি তাঁহার ক্রোধের চেয়েও মারাত্মক। মানবজীবনের দুঃখের লবণাম্বুরাশির দ্বীপমালার ভ্রান্ত পথিক ইউলিসিসের মত ভল্‌টেয়ার গৃহে ফিরিয়া দেখেন যে মানুষের শুভবুদ্ধিকে মূঢ় প্রণয়ীর দল ঘিরিয়া ধরিয়াছে। তখন তাঁহার ধনুক হইতে যে *Candide*-শর নিক্ষিপ্ত হইল তাহা আজিও মূঢ়তার সপ্ততাল ভেদ করিতে করিতেই চলিয়াছে। ভল্‌টেয়ার কখনো ভোলেন নাই যে ব্যঙ্গ উদ্দেশ্যমূলক, এবং নিজের উদ্দেশ্যের মূল সম্বন্ধেও তিনি সর্বদা সচেতন ছিলেন যে ধর্মান্ধতা ও মূঢ়বুদ্ধিই মানুষের শ্রেষ্ঠ শত্রু।

পূর্বেই বলিয়াছি, ব্যঙ্গরসিকের সহজাত দৃষ্টি লইয়াই ত্রৈলোক্যনাথ জন্মিয়াছিলেন। তিনি কি চাহিতেন তিনি জানিতেন। তিনি জানিতেন মানুষ বড়ই হৃদয়হীন, বড়ই নৃশংস। ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তা ছাড়া আর-কিছু বড় তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে না। পৃথিবী যে স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইতে পারে না তাহা তিনি জানিতেন। তবে মানুষে আর-একটু যদি হৃদয়বান্ হয়, আর-একটু পরার্থপর হয়, আর-একটু বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হয় তবে সংসারের দু-একটি কণ্টক উৎপাটিত হইয়া স্থানটা আর-একটু

ভদ্ররকম ও বাসোপযোগী হয়। ইহাই তো যথেষ্ট। ইহার বেশি আর-কিছু হওয়া সম্ভব নয়, তাই তদধিক তিনি কিছু চাহিতেন না। ভল্‌টেয়ারের ক্ষেত্রে যেমন ধর্মান্ধতা ও বুদ্ধির মূঢ়তা, ত্রৈলোক্যনাথের ক্ষেত্রে তেমনি হৃদয়হীনতা ও ব্যক্তিগত স্বার্থ। এই দুটির কবল হইতে মানুষ আর-একটু মুক্ত হোক, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। আর এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটুখানি সজাগ করিয়া তোলাই তাঁহার শিল্পের উদ্দেশ্য ছিল।

মানুষ কেবল যে মানুষের প্রতি হৃদয়বান্‌ হইবে মাত্র তাহাই নয়, ইতর প্রাণীর প্রতিও তাহার ব্যবহার সদয়তর হওয়া উচিত। ইতর প্রাণীর প্রতি মানুষে যে নৃশংস আচরণ করে ইহা তাঁহাকে বড় বাজিত। মূঢ় পশুদের প্রতি এমন করুণা অল্প বাঙালি সাহিত্যিকের রচনাতেই দেখিতে পাওয়া যায়।

একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। গড়গড়িমহাশয় কলিকাতায় গিয়া তাহার গুরুদেবের কশাইবৃত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। তাহার গুরুদেবের পাঁঠার বেনামে ছাগল বধের কৌশল বর্ণিত হইতেছে—

> তাহার পর তাহার [ছাগলটির] মুখদেশ নিজের পা দিয়া মাড়াইয়া জীয়ন্ত অবস্থাতেই মুণ্ডদিক্‌ হইতে ছাল ছাডাইতে আরম্ভ করিলেন। পাঁঠার মুখ গুরুদেব মাড়াইয়া আছেন, সুতরাং সে চীৎকার করিয়া ডাকিতে পারিল না। কিন্তু তথাপি তাহার কণ্ঠ হইতে মাঝে মাঝে এরূপ বেদনাসূচক কাতর ধ্বনি নির্গত হইতে লাগিল যে, তাহাতে আমার বুক যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তাহার পর তাহার চক্ষু দুইটি! আহা, আহা! সে চক্ষু দুইটির দুঃখ আক্ষেপ ও ভর্ৎসনাসূচক ভাব দেখিয়া আমি যেন জ্ঞানগোচরশূন্য হইয়া পড়িলাম। ··আমি বলিয়া উঠিলাম, 'ঠাকুর মহাশয়, করেন কি! উহার গলাটা

প্রথমে কাটিয়া ফেলুন। প্রথমে উহাকে বধ করিয়া তাহার পর উহার চর্ম উত্তোলন করুন।' ঠাকুর মহাশয় উত্তর করিলেন, 'চুপ! চুপ! বাহিরের লোক শুনিতে পাইবে। জীয়ন্ত অবস্থায় ছাল ছাড়াইলে ঘোর যাতনায় ইহার শরীর ভিতরে ভিতরে অল্প অল্প কাঁপিতে থাকে। ঘন ঘন কম্পনে ইহার চর্মে এক প্রকার সরু সরু সুন্দর রেখা কম্পিত হইয়া যায়। এরূপ চর্ম দুই আনা অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। প্রথম বধ করিয়া তাহার পর ছাল ছাড়াইলে সে চামড়া দুই আনা কম মূল্যে বিক্রীত হয়। জীয়ন্ত অবস্থায় পাঁঠার ছাল ছাড়াইলে আমার দুই আনা পয়সা লাভ হয়। ব্যাবসা করিতে বসিয়াছি বাবা। দয়ামায়া করিতে গেলে আর ব্যাবসা চলে না।'· ·আর একবার আমি পাঁঠার চক্ষু দুইটির দিকে চাহিয়া দেখিলাম। সেই চক্ষু দুইটি যেন আমাকেও ভৎর্সনা করিয়া বলিল, আমি দুর্বল, আমি নিঃসহায়, এ ঘোর যাতনা তোমরা আমাকে দিলে। মাথার উপরে কি ভগবান্ নাই?

নৃশংসভাবে নিহত সেই অসহায় দুর্বল পশুটির দৃষ্টি ত্রৈলোক্যনাথের সমস্ত রচনার মধ্যে ছড়াইয়া আছে। সেই দৃষ্টি বারংবার পাঠককে ডাকিয়া বলে, আর কিছু নয়, তোমরা ওই অতিরিক্ত দুই আনার লোভ বর্জন করো। আমার ছাল যদি একান্তই চাও, অন্তত আগে আমাকে বধ করিয়া লও। মানুষের কাছে ত্রৈলোক্যনাথের আশা অতি যৎসামান্য, পশুবধ যদি নিতান্তই বর্জন করিতে না পার ব্যাপারটাকে যত অল্প সম্ভব নৃশংস করো। ষোলো আনার লোভ পরিত্যাগ যদি সম্ভব না হয় অতিরিক্ত দুই আনার লোভ পরিত্যাগ করো, তাহাতে তোমার ক্ষতি হইবে না।

পশুপক্ষী এবং মানবসমাজের অন্তর্গত অসহায় দুর্বলের প্রতি করুণা ত্রৈলোক্যনাথের রচনার প্রধানতম সম্পদ। ভলটেয়ারের হাসি শীতের তীব্র বাতাসের মত জলকণাশূন্য, তাহা হাড়ের ভিতর পর্যন্ত

কাঁপাইয়া তোলে। ত্রৈলোক্যনাথের হাসি শরতের প্রথম উত্তরের হাওয়া, তাহাতে শিশিরের স্পর্শ আছে।

এই জীবনদর্শন-প্রকাশের বাহন তাঁহার হাসি এবং তাঁহার ভাষা। তাঁহার ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সম্পদ ও অলৌকিক মহিমা আশা করা বৃথা। এই ভাষার প্রধান ঐশ্বর্য শরবৎ ঋজুগতি। ঋজুতাই ব্যঙ্গের প্রধান সম্পদ। ভাষা যদি ঋজু না হয় তবে ব্যঙ্গের প্রচণ্ডতার অনেকটাই মাঝপথে নষ্ট হইয়া যায়। অনাড়ম্বর সরল ভাষার মাধ্যম ব্যঙ্গের তীব্রতাকে একটুও নষ্ট হইতে দেয় না। আর এই অনাড়ম্বর ভাষার মেরুদণ্ড লেখকের অদ্ভুত পর্যবেক্ষণশক্তি। তাঁহার চারি দিকে যাহা ঘটিতেছে তীব্র পর্যবেক্ষণশক্তির আতস-কাঁচের ভিতর দিয়া তাহাকে তীব্রতর ভাবে রূপদানের ক্ষমতা তাঁহার অসাধারণ।

তাঁহার পর্যবেক্ষণশক্তি ও তাহার বাহনস্বরূপ অনাড়ম্বর ভাষার উদাহরণ পাপের পরিণাম (১৯০৮) গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইল—

> খাঁদা ভূত রাত্রে বিকট শব্দ করিতেছে হু হু হু হু। তেঁতুল-গাছ হইতে যাই এই শব্দ উত্থিত হইল আর চারি দিকে হুাক্কা-হুয়া হুাক্কা-হুয়া-হুঃ শৃগালগণ ডাকিয়া উঠিল। সেই সময় কাক পক্ষিগণ অন্ধকার না মানিয়া, বৃষ্টিবাদল না মানিয়া, বৃক্ষশাখা পরিত্যাগ করিয়া উড়িতে লাগিল। কা কা রবে একবার তাহারা এ ডালে বসিল, পুনরায় সে ডাল হইতে উড়িয়া অন্য ডালে গিয়া বসিতে লাগিল। নিকটস্থ বাঁশঝাড়ে বকের পাল পালকের ভিতর মস্তক লুকাইয়া ভিজিতেছিল। কক্-কক্ রবে তাহারাও চারি দিকে উড়িতে লাগিল। বাদুড়গণ সন্-সন্ রবে সে স্থান হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। পেঁচকগণ হুট্-হুট্ রবে রায়মহাশয়ের অট্টালিকাগাত্রে কোটরের ভিতর আশ্রয় লইল। নিকটস্থ কয়েক বাটী হইতে কুকুরগুলা ডাকিতে ডাকিতে বাহির হইল। কিন্তু কিছু দূর অগ্রসর

হইলে সেই সেই তেঁতুলগাছ তাহাদের নয়নগোচর হইল, আর তাহারা বসিয়া পড়িল। লাঙ্গুল ভিতরে রাখিয়া পশ্চাৎ-পদদ্বয়ের উপরে ভর দিয়া উচ্চভাবে বসিয়া, দূর হইতে তেঁতুলগাছের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া তাহারা অতি ভয়ংকর শব্দে ক্রন্দন করিতে লাগিল। সেই গভীর নিশাকালে সেই চীৎকারে একে লোকের হৃদয় কম্পিত হইয়াছিল, তাহার পরে আবার সেই প্লুতস্বরে কুকুরের ক্রন্দনে আতঙ্কের আর সীমা রহিল না।

পশুপক্ষীর ব্যবহারের এই চিত্র বাস্তবতায় উজ্জ্বল। সহৃদয়তার দৃষ্টিতে পশুপক্ষীর জগৎকে যে দেখিয়াছে কেবল তাহার পক্ষেই এইরূপ পর্যবেক্ষণ সম্ভব।

পর্যবেক্ষণশক্তি যেমন ত্রৈলোক্যনাথের প্রচুর পরিমাণে ছিল কল্পনা-শক্তি তেমন ছিল না। বস্তুত দিব্য কল্পনাশক্তির যেন তাঁহার কিছু অভাব ছিল। আর কল্পনাশক্তির প্রাচুর্য ব্যতীত কেহই শিল্পের চূড়া স্পর্শ করিতে পারে না। শ্রেষ্ঠব্যঙ্গশিল্পীরও প্রচুর কল্পনাশক্তির প্রয়োজন। সত্য বলিতে কি, অনেক সময়েই দেখা যায় শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ-শিল্পীগণ উঁচুদরের কবিও বটে— যেমন মলিয়ের, অ্যারিস্টফেনিস এবং হায়নে। এই কল্পনাশক্তির অভাবেই তিনি শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গশিল্পীদের অন্যতম হইতে পারেন নাই, শ্রেষ্ঠ বাঙালি ব্যঙ্গশিল্পী মাত্র হইয়া আছেন। তাঁহার ভূত ও মানুষ (১৮৯৬) গ্রন্থের প্রথম গল্প বাঙাল নিধিরাম কোনো কোনো স্থানে হুগোর *Toilers of the Sea*র অনুক্রমণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহা লেখকের অভিপ্রেত কি না জানি না। কিন্তু এ দাবি করা উচিত নয়। বাঙাল নিধিরামে সহৃদয়তাগুণ আছে, পর্যবেক্ষণশক্তির অভাব নাই, গল্প বলিবার ক্ষমতাও অসাধারণ, কিন্তু হুগোর কাব্য-উপন্যাসের এবং তাঁহার সমস্ত রচনারই যাহা প্রধান গুণ সেই অলৌকিক কল্পনাশক্তি কোথায়? হুগোর যে

কল্পনার নিকটে সমুদ্রও গোষ্পদ, সেই কল্পনা কোথায়? হুগোর কল্পনা ও ভাষার কোটালের বন্যা না থাকিলে তাঁহার কাব্যের (*Toilers of the Sea* কাব্য ছাড়া আর কি?) অনুসরণ করিবার আশা বৃথা। যে গুণে হুগোর মহত্ত্ব, সেই গুণেই ত্রৈলোক্যনাথের দীনতা; কাজেই হুগোকে অনুসরণ করিবার শক্তি তাঁহার স্বল্পতম। বরঞ্চ তিনি ভল্‌টেয়ার বা সুইফ্‌টের কোনো গ্রন্থের ভাবানুসরণ করিলে আশাতীত সাফল্য লাভ করিতে পারিতেন।

ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গদৃষ্টি, জীবনদর্শন, বিশেষ শক্তি ও বিশেষ শক্তির অভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম, এবার তাঁহার শিল্পের টেকনিক সম্বন্ধে আমাদের ধারণা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

৩

ত্রৈলোক্যনাথ গল্প বলিবার সহজাত শক্তি লইয়া জন্মিয়াছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে এই শক্তি অতিশয় বিরল। গল্প অনেকেই লেখেন, কিন্তু গল্প বলিবার ভঙ্গি সাহিত্য হইতে প্রায় লোপ পাইবার মুখে। সাহিত্য লিখিত-আকার ধারণ করিবার পূর্বে গল্প বলিবার ভঙ্গি মানব-সমাজে প্রচলিত ছিল, কিন্তু তাহা লুপ্তপ্রায়। এখন আমরা গল্প পড়ি, গল্প শুনি না। ত্রৈলোক্যনাথের প্রতিভার মধ্যে গল্প বলিবার আদিম-শক্তি বিদ্যমান। সে গল্পও আবার বাংলায় যাহাকে আষাঢ়ে গল্প বলে। এ শক্তি বাংলা সাহিত্যে অতি বিরল বলিলেও চলে।

আরব্যোপন্যাস এখন লিখিত-আকার ধারণ করিলেও তাহার মধ্যে মূল কথনগুণ এখনো যেন ধ্বনিত। ইহা পড়িবার সময়ে মনে হয় গল্প পড়িতেছি না, অদৃশ্য কথক বলিয়া যাইতেছে, আমরা শুনিতেছি। ত্রৈলোক্যনাথের গল্প সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। আরও একটি কারণে আরব্যোপন্যাসের উল্লেখ করিতে হইল। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের

টেকনিক বস্তুত আরব্যোপন্যাসের টেকনিক। এই অমর কাব্য উপন্যাস নয়, আবার গল্পও নয়— অফুরন্ত গল্প-শৃঙ্খল। একটি গল্পের সহিত আর-একটি গল্প গ্রন্থিযুক্ত হইয়া শ্রোতার অন্তহীন মনোযোগের শেষ সীমা পর্যন্ত চলিয়াছে। ত্রৈলোক্যনাথের অধিকাংশ গ্রন্থই গল্পের শৃঙ্খল। কঙ্কাবতী (১৮৯২), পাপের পরিণাম (১৯০৮), ফোকলা দিগম্বর (১৯০১) ও বাঙাল নিধিরাম ব্যতীত আর সব রচনাই গল্পের মালা ছাড়া আর কিছু নয়। ডমরু-চরিত (১৯২৩), মজার গল্প (১৯০৬), মুক্তামালা (১৯০২) এমন কি ভূত ও মানুষ -এর লুল্লু সবই গল্পসমষ্টি। এগুলি উপন্যাসও নয় ছোট গল্পও নয়, একটি কাঠামোর মধ্যে অনেকগুলি গল্পের সমষ্টি মাত্র। একটা শক্ত কাঠামোর মধ্যে সমস্ত বিষয়টাকে ঘনীভূত করিয়া আঁটিয়া দিলে কথনগুণ অনেক পরিমাণে লোপ পায়। সে চেষ্টা লেখক করেন নাই। শিথিলপিনদ্ধ ফ্রেমের মধ্যে বহুতর গল্পকে সন্নিবেশ করিয়া রস জমাইয়া তুলিয়াছেন। ইহাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। এ গুণ সামান্য গুণ নয়।

তাঁহার রচনার আর-একটি বৈশিষ্ট্য সকলেরই চোখে পড়িবে। তাঁহার অধিকাংশ গল্পের উপাদান ভূতপ্রেত, দৈত্যদানা। স্বপ্ন বা তজ্জাতীয় অতিপ্রাকৃত অভিজ্ঞতা তাঁহার অন্যতম প্রকাশপন্থা। কিন্তু তজ্জন্য তাঁহাকে ভুতুড়ে গল্পের লেখক বলিয়া সংক্ষেপে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। তাঁহার উপাদান ভূতপ্রেত, কিন্তু কেবল ভুতুড়ে গল্প বলা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে।

সুইফ্‌ট্ গালিভারের ভ্রমণবৃত্তান্তে ক্ষুদ্রকায় লিলিপুট ও অতিকায় ব্রব্‌ডিংনাগের অবতারণা করিয়াছেন। কি জন্য ? মানবচরিত্রের অসংগতি প্রদর্শনই তাঁহার লক্ষ্য। এই অসংগতিকে প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্রকায়িক ও অতিকায়িক জীবের সৃষ্টি করিয়া তুলনায় মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা ও শক্তিসামর্থ্যের নিরর্থকতা দেখাইয়া

দিয়াছেন। ঠিক এই কারণেই ত্রৈলোক্যনাথের গল্পে ভূতপ্রেতের আবির্ভাব ; মানুষের খেয়ালখুশি ও কল্পনাকে যথেচ্ছ দৌড় দিবার উদ্দেশ্যেই বাস্তববন্ধনবর্জিত স্বপ্নপ্রসঙ্গের অবতারণা।

মানুষের অসংগতি দেখাইতে হইলে তাহার সহিত তুল্য আবশ্যক। ভূতপ্রেতের সমাজের সহিত মানবসমাজের তুলনা অতিশয় সহজ ও বহু-প্রচলিত। কাজেই তাঁহাকে বাধ্য হইয়া ভূতপ্রেতের সমাজের সাহায্য লইতে হইয়াছে। মানুষকে ব্যঙ্গ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য, ভৌতিক গল্প বলা নয়।

লুল্লু গল্পে একটি ভূতকে খবরের কাগজের সম্পাদক করিয়া দিবার লোভ দেখাইয়া গল্পের নায়ক আমীর তাহাকে বশ করিয়া ফেলিল। আমীর বলিতেছে, মানুষ-সম্পাদকের গালিতে আর খবরের কাগজ আগের মতন বিকায় না, এখন ভূত-সম্পাদক হইয়া ভূতের গালি প্রয়োগ করিলে কাগজ বিকাইবার অধিকতর সম্ভাবনা। ভূতে ও মানুষে এই যে অসংগতি, এবং এই অসংগতিজাত ব্যঙ্গ, ইহা আর কি ভাবে ফুটানো যাইত !

আর-এক স্থলে তিনি বাংলা থিয়েটারকে ব্যঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে শবসাধনার উল্লেখ করিয়াছেন। শবসাধক আর-সব বিভীষিকাকে জয় করিতে সমর্থ হইল কিন্তু ভৌতিক সত্তা থিয়েটারের বীরের ভঙ্গিতে আসিয়া তাহাকে আহ্বান করা মাত্র সে শবাসন ছাড়িয়া পলায়ন করিল, মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। ইহা এত সহজে ও সম্পূর্ণভাবে আর কেমন করিয়া দেখানো যাইত ?

ঠিক এই একই উদ্দেশ্যে স্বপ্নপ্রসঙ্গেরও অবতারণা তাঁহার রচনায়। কঙ্কাবতীর স্বপ্ন, ভূত ও মানুষ গ্রন্থের বীরবালা গল্পে নায়কের মূর্ছা তাঁহার বক্তব্যপ্রকাশের সমীচীনতম পন্থা। ত্রৈলোক্যনাথ যদি বাস্তবপন্থার লেখক হইতেন তবে এসব দোষ বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু

ব্যঙ্গশিল্পে এগুলি দোষ তো নয়ই বরঞ্চ এইগুলিই সর্বজনস্বীকৃত বহুসমাদৃত চিরকালীন প্রকাশভঙ্গি।

ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলীর মধ্যে কঙ্কাবতী সবচেয়ে জনপ্রিয়। বাংলাদেশের বহুপ্রচলিত একটি জনশ্রুতিকে অবলম্বন করিয়া উপন্যাসাকারে সামাজিক ব্যঙ্গের এই উর্ণাতন্তু রচিত। ভূতপ্রেত ও স্বপ্নদর্শন প্রভৃতি লেখকের প্রিয় টেকনিক ইহাতে গৃহীত হইয়াছে। কঙ্কাবতীর রোগশয্যায় স্বপ্ন ও প্রলাপই পরবর্তী কাহিনীর বৃহত্তর অংশের বাহন। ইহাকে আপাতদৃষ্টিতে ভূতের গল্প বা আষাঢ়ে কাহিনী বলিয়া মনে হইলেও ইহা মূলত সামাজিক ব্যঙ্গ ছাড়া আর কিছু নয়। গালিভারের ভ্রমণবৃত্তান্ত ও ডন্‌কুইক্‌সটের অপূর্ব কাহিনী প্রভৃতির মত এই শ্লেষপূর্ণ চমকপ্রদ গ্রন্থ একাধারে বালক ও বয়স্ক দুই শ্রেণীর পাঠকেরই প্রিয়।

পাপের পরিণাম ও ফোকলা দিগম্বরে গল্পের জাল বুনিবার অসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শিত হইয়াছে। পাপের পরিণাম স্পষ্টত নীতিকথাপ্রচারের উদ্দেশ্যে লিখিত। এমন স্থলে গ্রন্থ প্রায়ই নীরস ও প্রাণহীন হইয়া পড়ে। কিন্তু লেখকের শিল্পকৌশল গ্রন্থখানাকে আশ্চর্যরকমের সজীব ও চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিয়াছে।

বীরবালা একখানা রূপক-কাহিনী। খুব সম্ভবত ভারতবর্ষের বর্তমান দুর্দশা, তাহার প্রাচীন গৌরব, ইংলণ্ডের সহিত এ দেশের যোগস্থাপন প্রভৃতিই কাহিনীর অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত।

কিন্তু লেখকের বিশিষ্টতম শক্তি প্রকাশিত হইয়াছে ডমরু-চরিত, ভূত ও মানুষ গ্রন্থের লুল্লু ও নয়নচাঁদের ব্যাবসা, এবং মুক্তা-মালার কোনো কোনো গল্পে।

ডমরুধর ও নয়নচাঁদ তাঁহার দুইটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি, আর শুধু তাই নয়, বাংলা সাহিত্যের আসরেও তাহাদের জুড়ি মেলা ভার। ইহাদের

বিস্তৃত পরিচয় দিতে গেলে আস্ত বই দুখানাই উদ্ধার করিয়া দিতে হয়। তাহার চেয়ে বই-দুখানা পড়িয়া লইবার ভার পাঠকের উপরে ছাড়িয়া দেওয়াই ভালো।

৪

ত্রৈলোক্যনাথের মত বাংলা সাহিত্যের একজন মহৎ লেখকের অবলুপ্তির কারণ কি। কারণ যাহাই হোক, ইহা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। ত্রৈলোক্যনাথের মৃত্যু হয় ১৯১৯ সালে। ঠিক এই সময়েই শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব। শরৎসাহিত্যের আত্যন্তিক জনপ্রিয়তা যে ত্রৈলোক্যনাথের বিস্মৃতির একটি কারণ তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। ঠিক এই একই কারণে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও সাধারণ পাঠকের চিত্ত হইতে অপসৃত হইয়াছেন। অথচ ইঁহারা স্ব স্ব ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের মতই অসাধারণ। তবে এমন কেন হইল? শরৎসাহিত্যের সর্বজনবোধ্যতা, সহজসম্বেদ, ভাষার উজ্জ্বলতা ও ঈষৎলঘু ভাবালুতার নিকটে পূর্বোল্লিখিত লেখকদ্বয়ের ব্যঙ্গ রঙ্গ ও কশাঘাত, উদ্দেশ্যমূলক হাসি এবং বুদ্ধির প্রতি আবেদন পরাজিত হইয়াছে। অশ্রুর নিকটে হাসির পরাজয়, ভাবালুতার আবেদনের নিকটে বুদ্ধির পরাজয়। ইহা স্বাভাবিক হইলেও যুগলক্ষণাক্রান্ত ঘটনা। বাঙালি পাঠকের কাছে বুদ্ধির চেয়ে হৃদয়াবেগের আবেদনই অধিকতর উগ্র হইয়া উঠিয়াছে, শরৎসাহিত্যের জনপ্রিয়তা তাহারই একটি প্রকাশ। ত্রৈলোক্যনাথ বিস্মৃতপ্রায় হইলেও তাঁহার বিশিষ্ট রচনারীতি লুপ্ত হয় নাই। পরশুরাম ও আধুনিকতর কোনো কোনো লেখকের ব্যঙ্গরচনায় তাঁহারই ধারা প্রবাহিত। কাজেই তাঁহার প্রতিভা বন্ধ্যা নহে, পরবর্তী অনেক রচনার জননী।

কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথ ও প্রভাতকুমারের রচনায় চিরকালীন বস্তুর

অভাব নাই। কাজেই তাঁহাদের ক্ষণিক অবলুপ্তি স্থায়ী নশ্বরতা নহে। তাঁহাদের রচনার পুনরাবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। এখন উদ্‌যোগী প্রকাশকগণ তাঁহাদের গ্রন্থাবলীর সহজলভ্য নির্ভরযোগ্য সংস্করণ বাহির করিলে এই আবির্ভাবের স্পৃহনীয় আনুকূল্য করিবেন। তাঁহাদেরও ক্ষতি হইবে না, আবার বাঙালি পাঠকগণও লাভবান হইবেন।

রমেশচন্দ্র দত্ত

১৮৪৮ - ১৯০৯

রমেশচন্দ্র দত্তের প্রথম উপন্যাস বঙ্গবিজেতা ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত হয়, তখন তাঁহার বয়স ছাব্বিশ বৎসর। ১৮৭৪ সালে বাংলা উপন্যাসের ধারা সুদীর্ঘ হইয়া উঠে নাই; তখন উপন্যাস-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, এখনো তিনিই শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। ১৮৭৪ সাল অবধি বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী কপালকুণ্ডলা মৃণালিনী বিষবৃক্ষ ইন্দিরা ও যুগলাঙ্গুরীয় প্রকাশিত হয়। ১৮৭২ সাল হইতে বঙ্গদর্শন বাহির হইতে থাকে। এই ঘটনাগুলি মনে রাখিলে রমেশচন্দ্রের উপন্যাস ও তাহার ধারাবাহিকতা বুঝিতে সুবিধা হইবে।

রমেশচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্যাস মাধবীকঙ্কণ প্রকাশিত হয় ১৮৭৭ সালে। জীবন-প্রভাত ও জীবন-সন্ধ্যা যথাক্রমে ১৮৭৮ ও ১৮৭৯ সালে প্রকাশিত হয়। তার পরে কয়েক বৎসরের ছেদ পড়িয়া তাঁহার সংসার ও সমাজ যথাক্রমে ১৮৮৬ ও ১৮৯৪ সালে আত্মপ্রকাশ করে। তাঁহার উপন্যাসের ধারার এইখানেই সমাপ্তি। বস্তুত এইখানেই তাঁহার জীবনের রসসাহিত্যপর্বের সমাপ্তি। ইহার পরে ও আগে আর যেসমস্ত গ্রন্থ তিনি লিখিয়াছেন সেসব হয় ইংরেজি ভাষায়, নয় বাংলা ভাষায় অনুবাদগ্রন্থ। সেসব আমাদের আলোচনার বিষয় নহে। বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বস্তু রমেশচন্দ্র দত্তের উপন্যাস, তদধিক কিছু নয়। যদিচ তদধিক আলোচনার অনেক বিষয়, অনেক গুরুতর বিষয়, তাঁহার জীবনে ও ব্যক্তিত্বে রহিয়াছে।

রমেশচন্দ্রের উপন্যাস-ছয়খানি দুইটি পর্যায়ভুক্ত। বঙ্গবিজেতা মাধবীকঙ্কণ জীবন-প্রভাত ও জীবন-সন্ধ্যা এক পর্যায়ভুক্ত; এগুলি

সমগোত্রভুক্ত বলিয়াই শতবর্ষ (১৮৭৯) নামে একত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। এই চারিখানি উপন্যাসকে অন্য নামের অভাবে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাক। বঙ্গবিজেতা ও মাধবীকঙ্কণকে ঠিক ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা চলে কি না সে তর্ক উঠিতে পারে, কিন্তু জীবন-প্রভাত ও জীবন-সন্ধ্যা সম্বন্ধে তর্কের স্থান নাই। বস্তুত এই দুইখানিই প্রকৃত বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস।

বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ চন্দ্রশেখর মৃণালিনী প্রভৃতিকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিবার লোভ হইলেও সে লোভ সংবরণ করা উচিত, যেহেতু এইসব কাহিনীতে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসনির্দিষ্ট সীমানাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন, শিল্পীর দৃষ্টি আর ভারতভাগ্যবিধাতার দৃষ্টি ভিন্ন নামে বাণসংযোজন করিয়াছে। কাজেই এসব গ্রন্থ ঐতিহাসিক উপাদানে গঠিত হইলেও ঠিক ঐতিহাসিক পর্যায়ভুক্ত নয়।

বঙ্গবিজেতা উপন্যাসের কাহিনীকাল ১৫৮০ সাল। তখন আকবরের আমল। ইহার ঐতিহাসিক অংশের নায়ক টোডরমল্ল। ইহার ঘটনার স্থান বাংলাদেশ। মাধবীকঙ্কণের কাহিনীকাল শাহ্‌জাহানের সময়, ১৬৫৪ সাল। ইহার নায়কনায়িকা বাঙালি হইলেও ঘটনার ক্ষেত্র বাংলাদেশের বাহিরে দিল্লী ও আগরা পর্যন্ত বিস্তৃত। জীবন-সন্ধ্যার ঘটনাকাল ১৫৭৬ সাল। আকবর ও প্রতাপসিংহ ঐতিহাসিক প্রধান ব্যক্তি, আর জীবন-প্রভাতের নায়ক শিবাজী— ১৬৬৩ সালের উল্লেখ উপন্যাসে আছে। বঙ্গবিজেতার ১৫৮০ সাল হইতে আরম্ভ ধরিলে জীবন-সন্ধ্যার ১৬৬৩ সাল পর্যন্ত এক শত বৎসর ধরিতে হইবে। এই শতবর্ষের বিশেষ ঘটনা আকবরের প্রভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, রাজপুত শক্তির জীবন-সন্ধ্যা এবং আওরংজেবের সময়ে শিবাজীর প্রভাবে মহারাষ্ট্রশক্তির জীবন-প্রভাত। এই চারিখানি উপন্যাসে লেখক ভারতবর্ষের সন্ধ্যাপ্রভাত ও সন্ধিবিগ্রহের শতবর্ষকে অঙ্কিত করিতে চেষ্টা

করিয়াছেন, আর সেই উপলক্ষে প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষের ভূখণ্ডে তাঁহাকে পর্যটন করিতে হইয়াছে।

রমেশচন্দ্র তাঁহার প্রিয় গ্রন্থকারের উল্লেখ উপলক্ষে লিখিতেছেন—

Sir Walter Scott was my favourite author forty years ago. I spent days and nights over his novels ; I almost lived in those historic scenes and in those mediæval times which the great enchanter had conjured up. . . I do not know if Sir Walter Scott gave me a taste for history, or if my taste for history made me an admirer of Scott ; but no subject, not even poetry, had such a hold upon me as history.

রমেশচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মর্ম বুঝিবার পক্ষে এই অংশটুকু মূল্যবান। দুটি কথা বুঝিতে পারা যায়— স্কট তাঁহার প্রিয়তম ঔপন্যাসিক আর ইতিহাসে তাঁহার নিবিড়তম আকর্ষণ। তবে স্কটের উপন্যাস হইতে ইতিহাসপ্রিয়তা বা ইতিহাসপ্রিয়তা হইতে স্কটের উপন্যাস, গতির দিকটা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। স্কটের উপন্যাস একাধারে ইতিহাস ও সাহিত্য, একত্রে এই দুটি রমেশচন্দ্রের প্রিয়তম বিষয় বোঝা যাইতেছে। কিন্তু তিনি যে বাংলা লিখিবেন, বাংলা উপন্যাস লিখিবেন এবং স্কটের আদর্শে লিখিবেন, তাহা তিনি কখনো ভাবেন নাই। এমন সময়ে একদা বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তাঁহার আলাপ হইয়া গেল। রমেশচন্দ্রের ভাষাতেই শোনা যাক—

বঙ্কিমবাবু তখন বঙ্গদর্শন বাহির করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। ভবানীপুরে একটি ছাপাখানা হইতে ঐ কাগজখানি প্রথমে বাহির হয়, তথায় বঙ্কিমবাবু সর্বদা যাইতেন ; সেই ছাপাখানার নিকটে আমার বাসা ছিল, বলা বাহুল্য বঙ্কিমবাবু আসিলেই আমি সাক্ষাৎ করিতে

যাইতাম। একদিন বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের কথা হইল, আমি বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসগুলির প্রশংসা করিলাম, তাহা বলা বাহুল্য। বঙ্কিমবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'যদি বাংলা পুস্তকে তোমার এত ভক্তি ও ভালোবাসা তবে তুমি বাংলা লেখ না কেন?' আমি বিস্মিত হইলাম। বলিলাম, 'আমি যে বাংলা লেখা কিছুই জানি না। ইংরেজি বিদ্যালয়ে পণ্ডিতকে ফাঁকি দেওয়াই রীতি, ভালো করিয়া বাংলা শিখি নাই, কখনো বাংলা রচনাপদ্ধতি জানি না।' গম্ভীর স্বরে বঙ্কিমবাবু উত্তর করিলেন, 'রচনাপদ্ধতি আবার কি—তোমরা শিক্ষিত যুবক, তোমরা যাহা লিখিবে তাহাই রচনাপদ্ধতি হইবে। তোমরাই ভাষাকে গঠিত করিবে।' এই মহৎ কথা বরাবরই আমার মনে জাগরিত রহিল।

ইংরেজি ও বাংলা এই দুই অংশের মর্ম জুড়িয়া লইলে রমেশচন্দ্রের উপন্যাসরচনার সম্যক ইতিহাস পাওয়া যাইবে। স্কটের উপন্যাসে তন্ময়তা, বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক বাংলা লিখিতে উৎসাহ প্রদান— এ দুইয়ের বাস্তব ফল তাঁহার বাংলা উপন্যাস রচনা। রমেশচন্দ্রের আশঙ্কা ছিল তিনি বাংলা লিখিতে পারেন না, কারণ পণ্ডিতকে ফাঁকি দেওয়াই তখনকার রীতি ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, তোমরা যাহা লিখিবে তাহাই রচনাপদ্ধতি হইবে, তোমরাই ভাষাকে গঠিত করিবে। এই উপদেশের বাস্তব দৃষ্টান্ত রমেশচন্দ্রের ছয়খানি বাংলা উপন্যাস। অবশ্য স্কটের উপন্যাসের বাংলা দৃষ্টান্ত তাহার সম্মুখে বর্তমান ছিল— বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী এবং আরও পরবর্তী কালের যুগলাঙ্গুরীয় ও চন্দ্রশেখর। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস তাঁহার প্রিয় ছিল, তাহাদের প্রশংসা করিবার উদ্দেশ্যে তিনি ভবানীপুরে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করেন। বঙ্গবিজেতা রচনার পূর্ববর্তী বঙ্কিমী উপন্যাসগুলির নাম উপরে করিয়াছি, কপালকুণ্ডলার নাম বাদ দিয়াছি। কপালকুণ্ডলার দ্বারা প্রভাবিত

হইবার মত মন রমেশচন্দ্রের ছিল না। তিনি এই সময়ে দুর্গেশনন্দিনী ও মৃণালিনীতে ওতপ্রোত হইয়া ছিলেন। এ দুখানি রচিত না হইলে বঙ্গবিজেতা রচিত হইতে পারিত না। মাধবীকঙ্কণে পূর্বোক্ত দুইখানি উপন্যাস ছাড়াও বিষবৃক্ষের প্রভাব স্পষ্ট, তৎপূর্বেই বিষবৃক্ষ প্রচারিত হইয়াছে। কেবল এক জায়গায় শিষ্য হয়তো বা গুরুকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। রাজসিংহ ও জীবন-প্রভাত একই বাংলা বৎসরে দুইটি মাসিকে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষুদ্রায়তন রাজসিংহ ১২৮৪ চৈত্র হইতে ১২৮৫ ভাদ্র সংখ্যা বঙ্গদর্শনে অংশত প্রকাশিত। জীবন-প্রভাত ১২৮৫ সালের প্রথম হইতে দশম সংখ্যা বান্ধবে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত। রমেশচন্দ্র জীবন-প্রভাত লিখিবার আগে কি রাজসিংহ দেখিয়াছিলেন? রমেশচন্দ্রের পক্ষে রাজসিংহ না দেখা বিচিত্র। কিন্তু তাহাতেও ক্ষতি নাই, যেহেতু পত্রিকায় প্রকাশিত হইবার পূর্বে কল্পনায় নিশ্চয় উপলব্ধ হইয়াছিল, তাহার উপরে রাজসিংহের প্রভাব থাকা সম্ভব নয়। এইসব কারণে 'হয়তো' শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। তবু এক জায়গায় রমেশচন্দ্রেরই জিত। রাজসিংহ সার্থকতর উপন্যাস, বাংলা সাহিত্যের বৃহত্তম পটভূমি-সংযুক্ত মহত্তম উপন্যাস। জীবন-প্রভাত ও জীবন-সন্ধ্যা সার্থকতর ঐতিহাসিক উপন্যাস, বাংলা সাহিত্যের সার্থকতম ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইহাতে উপন্যাস-শিল্পের দুর্গের উপরে ইতিহাসের পতাকাটাই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। শিল্পশক্তির অপেক্ষা ইতিহাসের মর্মজ্ঞান লেখকের অধিকতর ছিল। ইহার বিপরীত সম্ভব হইলে রমেশচন্দ্রের সাহিত্যিক স্মৃতি আজ উজ্জ্বলতর হইত।

২

ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিতে কোন্ শ্রেণীর রচনা বোঝায় তাহার সংজ্ঞা নির্ণয় সহজ নহে। তবে দুটি স্থূল বিষয় মনে রাখিলেই কাজ

চলিতে পারে। এক শ্রেণীর ঐতিহাসিক উপন্যাসে কোনো বিশেষ পর্বের ঐতিহাসিক ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে নায়ক করিয়া গল্প রচনা করা যাইতে পারে, আবার ঐতিহাসিক ব্যক্তিকে অন্তরালে বা গৌণ রাখিয়া কল্পিত চরিত্র সৃষ্টি করিয়াও গল্প রচনা করা চলে, তবে দেখিতে হইবে যে, গল্পের মধ্যে বিশিষ্ট পর্বের সত্য ইতিহাসের সীমানাকে অতিক্রম করিয়া না যায়। স্কট তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলিতে এই দুই দাবিকেই রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ; ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং বিশিষ্ট পর্বের সাধারণ ব্যক্তিদের চরিত্র দুটিতেই তিনি ইতিহাসের দাবি রক্ষা করিতে প্রাণপণ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক ব্যক্তির চরিত্রচিত্রণে লেখক অনেকটা হাতপা-বাঁধা, কিন্তু সাধারণ লোকের চরিত্রসৃষ্টিতে তিনি অপেক্ষাকৃত স্বাধীন। কিন্তু তাঁহাকে সর্বদা মনে রাখিতে হয় যে, সেই পর্বের সত্যকে লঙ্ঘন করিলে চলিবে না। কোনো কোনো ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনা দেবীচৌধুরাণীতে আছে বলিয়া পাছে কেহ তাহাকে ঐতিহাসিক উপন্যাস মনে করিয়া বসে, তাই বঙ্কিমচন্দ্র ভূমিকায় সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। আনন্দমঠের সন্ন্যাসীবিদ্রোহ ঐতিহাসিক ঘটনা হইলেও উক্ত গ্রন্থ কোনোক্রমেই ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। আনন্দমঠের সন্ন্যাসীগণের দেশপ্রাণতা এবং দেবীচৌধুরাণীর নিষ্কাম কর্ম ঐতিহাসিক সত্য নয়, নিতান্তই লেখকের সমকালীন সত্য।

রমেশচন্দ্র বঙ্গবিজেতা গ্রন্থে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় পরোক্ষ রীতি অবলম্বন করিয়াছেন। সরলা অমলা ইন্দ্রনাথ শকুনি সতীশচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই কাল্পনিক। যদিচ প্রসিদ্ধ টোডরমল্ল আছেন, তথাপি তিনি অনেকটা প্রচ্ছন্ন। কিন্তু কাল্পনিক চরিত্রগুলিতে তৎকালীন সত্য রক্ষিত হইয়াছে কি না বলা শক্ত, কারণ বাংলাদেশের তৎকালের সামাজিক জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিতে পারা যায় না। মাধবীকঙ্কণের নরেন্দ্র শ্রীশ হেমলতা শৈবলিনী প্রভৃতি কাল্পনিক

হইলেও এই গ্রন্থের ঘটনাস্রোত দিল্লী আগরা মথুরা প্রভৃতির প্রবলতর ঐতিহাসিক স্রোতের সহিত মিশিয়া পূর্বতন লক্ষ্যের স্তিমিত ভাব অনেকটা হারাইয়া ফেলিয়াছে। ইহাতে অধিকসংখ্যক ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও ঐতিহাসিক ঘটনা সংযোজিত। এখানিকে বলা চলে রমেশচন্দ্রের দুই শ্রেণীর ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যবর্তী সেতুবন্ধ। তাঁহার প্রথম শ্রেণীর রচনা বঙ্গবিজেতা ; ইহা পরোক্ষ ঐতিহাসিক রচনা, ঐতিহাসিক ব্যক্তি বা ঘটনা এখানে গৌণ। দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনা জীবন-প্রভাত এবং জীবন-সন্ধ্যা ; ইতিহাসের ঘটনা ও নায়কনায়িকা এখানে মুখ্য। প্রতাপসিংহ সেলিম শিবাজী যশোবন্ত শায়েস্তা খাঁ মানসিংহ এবং ভারতেতিহাসের সুপরিচিত ঘটনাবলী এই দুইখানি গ্রন্থের প্রধান সম্পদ ; কাল্পনিক চরিত্রগুলি স্বভাবতই অনেকটা প্রচ্ছন্ন ও নিষ্প্রভ। মাধবীকঙ্কণ এ দুইয়ের মধ্যবর্তী, এক শ্রেণী হইতে ভিন্ন শ্রেণীতে সংক্রমণের লক্ষণাক্রান্ত। জীবন-প্রভাত ও জীবন-সন্ধ্যার ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণের চরিত্রে ও ঘটনায় ইতিহাসের মর্যাদা অধিকতর সংরক্ষিত, এ কথা বলা অন্যায় হইবে না কারণ তাঁহাদের চরিত্র স্থূল রেখায় সুপরিজ্ঞাত, আর সূক্ষ্মভাবে জানিবার মত পাণ্ডিত্য রমেশচন্দ্রের যে ছিল তাহা তো বলাই বাহুল্য।

৩

রমেশচন্দ্রের অপর দুইখানি উপন্যাস সংসার ও সমাজ। সংসার প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ সালে, আর সমাজ প্রকাশের সময় ১৮৯৪ সাল। সংসার প্রকাশের পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাস প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে, আর সমাজ প্রকাশের পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র গত হইয়াছেন। এ দুইখানি পূর্বোক্ত চারিখানি হইতে ভিন্নগোত্রের উপন্যাস। এ দুটি সামাজিক উপন্যাস। পূর্বোক্ত চারিখানি যেমন এক পর্যায়ভুক্ত, পরবর্তী

দুইখানি তেমনি এক পর্যায়ের অন্তর্গত। বস্তুত সংসার ও সমাজকে একই গ্রন্থের দুই খণ্ড বলা উচিত। উভয় গ্রন্থের প্রধান পাত্রপাত্রী ও ঘটনাস্থান অভিন্ন; কালহিসাবে একটি পূর্বকাল অপরটি উত্তরকাল, একটির সূত্র অপরটিতে অনুসৃত।

ঐতিহাসিক উপন্যাস-রচয়িতা রমেশচন্দ্র পরিণত বয়সে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের সামাজিক উপন্যাস লিখিতে গেলেন কেন। বাহ্য কারণ এই যে, ইতিমধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র সামাজিক উপন্যাস রচনার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু অন্য কারণও আছে, সেটা মানসিক। রমেশচন্দ্র সংসার ও সমাজের উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিতেছেন—

> On principle inter-caste marriage is a duty with us, because it unites the divided and enfeebled nation, and we should establish this principle (as well as widow-marriage, etc.) safely and securely in our little society, so that the greater Hindu society, of which we are only a portion and the advanced guard, may take heart and follow. I cannot tell you how deeply I have felt this for years past ; of my last two novels, *Sansar* goes in for widow-marriage and *Samaj* . . goes in for inter-caste marriage.

রমেশচন্দ্র সংসারে বিধবাবিবাহ এবং সমাজে অসবর্ণবিবাহ সমর্থন করিয়াছেন। সে সময়ে ইহা দুঃসাহসিক ছিল। বিধবাবিবাহ আইনত স্বীকৃত হইলেও সমাজে গৃহীত হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র তত্ত্বত না হইলেও কার্যত বিধবাবিবাহের সপক্ষে ছিলেন না। কুন্দনন্দিনীকে মারিয়া না ফেলা অবধি তিনি স্বস্তি পান নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত ছিল যে, আইন করিয়া সমাজসংস্কার সম্ভব নয়, শিক্ষা প্রসারিত হইলেই আইনের

কাজ আপনিই ঘটিতে থাকিবে। আমাদের মনে হয়, দুই দিক হইতেই করিতে হইবে। শিক্ষাও চাই, আইনও চাই। শিক্ষার প্রসারে আইন প্রণয়নের সুবিধা হইবে, আবার আইন প্রণীত হইলে সংকুচিত ব্যক্তি উৎসাহ পাইবে। অসবর্ণবিবাহের তর্ক সেকালে আইনের ক্ষেত্রে বা আলোচনার ক্ষেত্রে অবধি দেখা দেয় নাই, কাজেই এ বিষয়ে সমাজ-সংস্কার বিষয়ক চিন্তানায়ক হিসাবে রমেশচন্দ্র বিশেষ অগ্রসর ছিলেন, খুব সম্ভব একক ছিলেন। তাঁহার রচনার মূলে ও রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব দেখিয়াছি, কিন্তু উভয় মনীষীর পার্থক্যটাও অল্প নহে। সংসার ও সমাজের চিন্তাসূত্র রমেশচন্দ্রের নিজস্ব, তাহাকে বঙ্কিমবিরোধী বলিলেও অন্যায় হইবে না। অথচ রহস্য এই যে, দুইজনেরই পাণ্ডিত্য অগাধ ছিল এবং হিন্দুশাস্ত্র ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাও অপরিসীম ছিল। যে সংস্কারের ভার যুগধর্ম ও মানবচরিত্রের স্বাভাবিক গতির উপর ছাড়িয়া দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চিন্ত ছিলেন, রমেশচন্দ্র তাহাকেই আইনপ্রণয়ন ও শিল্পের মাধ্যমে ত্বরান্বিত করিয়া তুলিতে সচেষ্ট ছিলেন, প্রভেদ এই মাত্র। এ প্রভেদ উভয়ের মানসিক গঠনের প্রভেদ।

৪

আনন্দমঠ দেবীচৌধুরাণী সীতারাম স্পষ্টত নীতিশিক্ষামূলক উপন্যাস। কিন্তু স্পষ্টত না হইলেও সূক্ষ্মত নীতিশিক্ষাদানের ভাব বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে প্রায় প্রথম আমল হইতেই দেখা যায়। দুর্গেশনন্দিনীকে নিছক কাহিনী বলিলেও মৃণালিনীকে নিছক কাহিনী বলা চলে না। হেমচন্দ্রের দেশপ্রেম, দেশোদ্ধারের সংকল্প নীতিশিক্ষার স্তরে পৌঁছিয়াছে। দাম্পত্য জীবনের দায়িত্ব বিষবৃক্ষের প্রধান বক্তব্য। রমেশচন্দ্রের বঙ্গবিজেতা বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীর ন্যায় একটি বিশুদ্ধ রোমান্স কাহিনী, অন্য কোনো উদ্দেশ্য ইহার নাই। দুর্গেশনন্দিনীর

তিলোত্তমা ও আয়েষার আদর্শে বঙ্গবিজেতার সরলা ও বিমলা গঠিত। এই দুই জুড়ির ঐক্য আকস্মিক নয়, অনুকরণজাত বলিয়াই মনে হয়। আয়েষার মতই বিমলা দুর্গেশনন্দিনী দুইজনেই কোমলে-কঠিনে ধৈর্যে-বীর্যে রচিত। এই দুই কাহিনীর অন্যান্য চরিত্রের মধ্যেও ঐক্য স্পষ্ট।

মৃণালিনীতে যে দেশপ্রেমের সূচনা, রমেশচন্দ্র তাহাকেই জীবন-সন্ধ্যা ও জীবন-প্রভাতে চরমে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। স্বদেশের প্রতি টান, তাহার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি গৌরবের ভাব লেখকের মনে এত অধিক মাত্রায় ছিল যে, তাঁহার চিত্তের আধার ছাপাইয়া তাহা উপন্যাস-দুটিকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছে।

মাধবীকঙ্কণে দাম্পত্য সম্বন্ধের দায়িত্বের সাক্ষাৎ পাই। বিবাহাতীত প্রেম যতই রমণীয় ও তীব্র হোক-না কেন দাম্পত্য বন্ধনকে তাহার ছিন্ন করা উচিত নয়, ইহাই মাধবীকঙ্কণের শিক্ষা। এ শিক্ষা হিন্দু-সমাজের শিক্ষা। সেই উৎস হইতে বঙ্কিমচন্দ্র ইহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কোনো-না-কোনো আকারে এই শিক্ষা ও নীতি বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসে বর্তমান। বিষবৃক্ষেও এই শিক্ষার রূপান্তর আছে। মাধবীকঙ্কণের শিক্ষার মূলে বিষবৃক্ষের ইঙ্গিত থাকাই সম্ভব। কিন্তু বৈধব্যের দ্বারা যেখানে দাম্পত্য বন্ধন অদৃষ্ট কর্তৃক ছেদিত সেখানে নূতন পতি গ্রহণ বিধেয়, সংসার উপন্যাসে রমেশচন্দ্র ইহাই বলিতে চান। এ দিক দিয়া বিচার করিলে রমেশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন। সে কথা আগেই বলিয়াছি।

বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসে সন্ন্যাসী ও তাহার অলৌকিক শক্তি সক্রিয়। রমেশচন্দ্রের উপন্যাসেও সন্ন্যাসী ও তাহার অলৌকিক ক্রিয়া বর্তমান। খুব সম্ভব দুইজনেই স্কটের উপন্যাস হইতে এই সূত্রটি লইয়াছিলেন।

জীবন-সন্ধ্যা ও জীবন-প্রভাত এবং সংসার ও সমাজ এই চারখানি

গ্রন্থ হইতে রমেশচন্দ্রের মানসিক গঠনের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। সম্পূর্ণ পরিচয় পাইতে হইলে তাঁহার কর্মজীবন ও অন্যান্য পুস্তকের সাক্ষ্যের প্রয়োজন হইবে, কিন্তু সে তলব আমাদের বর্তমান এলাকার বাহিরে।

জীবন-প্রভাত ও জীবন-সন্ধ্যা হইতে জানিতে পারি যে, লেখকের হৃদয় দেশাত্মবোধে ভরপুর ছিল ; এ দেশের গৌরবময় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও আকর্ষণের অন্ত ছিল না। তাহা ছাড়া দেশের ইতিহাস সম্বন্ধেও তাঁহার জ্ঞান সুগভীর ছিল।

এ যেমন দেশের প্রাচীন কাল সম্বন্ধে, তেমনি বর্তমান কাল সম্বন্ধে লেখকের মনোভাব জানিতে পাই সংসার ও সমাজ হইতে। তিনি প্রগতিমূলক সমাজসংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন, বিধবাবিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন কাম্য মনে করিতেন। ইংরেজি শিক্ষা ও প্রাচীন শিক্ষা, নূতন নাগরিক সভ্যতা ও প্রাচীন গ্রাম্য সভ্যতা এই দুই ধারার মধ্যেই ভালো-মন্দ আছে বলিয়া তাঁহার ধারণা ছিল, কোনোটাকেই সর্বথা ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য মনে করিতেন না, বা কোনো-এক ধারাকে অবলম্বন করিয়া আমরা চরিতার্থতা লাভ করিতে পারিব মনে করিতেন না। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, সমাজের কল্যাণ শিক্ষাদীক্ষার বিশেষ ধারার উপরে নির্ভর করে না, করে ব্যক্তির মনুষ্যত্বের উপরে। এই মনুষ্যত্ব বা চারিত্রের উপরেই তাহার ঝোঁক সংসার ও সমাজ গ্রন্থদ্বয়ে। অসাধারণ মানসিক ভারসাম্য থাকিলে তবেই লেখকের পক্ষে এইরূপ মধ্যপন্থা অবলম্বন সম্ভব। রমেশচন্দ্রের তাহা প্রচুর পরিমাণে ছিল। এই গুণ স্মরণ করিয়াই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন— তাঁহার চরিত্রে প্রাণের বেগের সঙ্গে অপ্রমত্ততার সম্মিলন ছিল।

৫

বাংলা সাহিত্যে রমেশচন্দ্রের স্থান কোথায় তাহা নির্ণয় করা সহজ নয়। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের তিন জন major বা মহৎ ঔপন্যাসিক। রমেশচন্দ্রকে এই দলভুক্ত বলা চলে না। বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাস সংসার ও সমাজের সাহিত্যিক সীমাকে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছে। আবার সংসার ও সমাজকে সমস্যামূলক উপন্যাস বলিয়া ধরিলে গোরা ও ঘরে বাইরে তাহাদের চেয়ে অনেক অগ্রসর, অনেক গভীর। বঙ্গবিজেতা অপরিণত রচনা। মাধবীকঙ্কণ নাটকীয় সম্ভাবনায় পূর্ণ হইলেও ভাবান্ধতাদোষে দুষ্ট। আমার মনে হয়, শেষপর্যন্ত জীবন-সন্ধ্যা ও জীবন-প্রভাতের উপরেই তাঁহার সাহিত্যিক খ্যাতি নির্ভর করিবে। গভীরতর জ্ঞান, ব্যাপকতর দৃষ্টি ও প্রচুরতর শিল্পবুদ্ধির সমন্বয়ে ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিত না হওয়া অবধি এই দুইখানি গ্রন্থই বাংলা সাহিত্যে যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস-রূপে বিরাজ করিতে থাকিবে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

১৮৫৩ - ১৯৩১

বাংলা গদ্যের ও পদ্যের প্রকৃতিতে একটা মূলগত প্রভেদ আছে। বাংলা পদ্যের মূল এই দেশের মাটিতেই নিহিত ছিল, বাংলা গদ্যের মূলে বিলাতি মাটি। রবীন্দ্রনাথের পদ্যের সহিত হাজার বছরের পুরানো বৌদ্ধ গান ও দোঁহার সম্বন্ধ নির্ণয় করা সম্ভব কি না জানি না। তবে এ কথা ঠিক যে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কাব্যের সহিত রবীন্দ্রকাব্যের জ্ঞাতিসম্বন্ধ খুব দূরস্থ নয়। চার-পাঁচ শ বছরে বংশধারায় যে পরিবর্তন দেখা যায়, তাহার বেশি নয়। আবার আন্‌কোরা সাহেব মাইকেলের অমিত্রাক্ষর খুব নূতন জিনিস বটে, ঐ আমরা যাহাকে বলিয়াছি বিলাতি মাটি, কিন্তু সেই বিলাতি মাটিরও বনিয়াদ বাংলাদেশের মাটি। কৃত্তিবাস ও কাশীরামদাসের পয়ার সেই দেশি মাটি। ইহাদের পয়ার না পাইলে মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দ লিখিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি, দেশজ কবিত্বপ্রবাহের ধারাকে তাঁহারা আত্মসাৎ করিয়া লইয়া বলশালী হইয়াছেন, আবার সেই ধারাকেও পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। বাংলা কাব্যপ্রতিভায় কোথাও একটা বড় রকমের ছেদ পড়ে নাই।

কিন্তু বাংলা গদ্যের ধারা একেবারে স্বয়ম্ভূ, হঠাৎ তাহার উদ্ভব, বিলাতি মাটি ভেদ করিয়া তাহার প্রকাশ। সেই কারণেই বোধ করি এখনো বাংলা গদ্য বাঙালির ধাতস্থ হয় নাই। সাধু ভাষা বনাম কথ্য ভাষার যে তর্কটা মাঝে মাঝে এখনো শোনা যায় তার মূলে আছে বিলাতি মাটি ও দেশি মাটির দ্বন্দ্ব। লোকের মুখের ভাষা অর্থাৎ লোকভাষার উপরে বাংলা গদ্যের বনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হইলে এ তর্ক এ

আকারে দেখা দিত না। বাংলা গদ্য পণ্ডিতের ভাষার উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সংস্কৃত ভাষার উপরেও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, খাস বিলাতি গদ্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এমন বস্তু যে আদৌ টিকিয়া আছে, পরিত্যক্ত বিলাতি হ্যাট-কোট-নেকটাইয়ের মত আবর্জনার স্তূপকে বাড়ায় নাই, ইহাই তো বিস্ময়ের। বিলাতি মাটিতে বাঁধানো বেদীর উপরে দেশি ঘাস ও গাছগাছড়া গজাইয়াছে; উপর হইতে বিদেশি বলিয়া ধরা পড়ে না, কিন্তু একটু সতর্কভাবে পা ফেলিলেই শক্ত শান পায়ে বাধে। অনেক সময়ে বাংলা গদ্য বুঝিতে না পারিলে মনে মনে তাহাকে ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়া লইবামাত্র সহজবোধ্য হইয়া পড়ে।

এখানে একটা প্রশ্ন দেখা দেয়। বাংলা গদ্য ইংরেজি গদ্যের অনুকরণে গড়িয়া না উঠিয়া যদি লোকভাষার উপরে গড়িয়া উঠিত, তবে তাহার কি আকার হইত। মনে করা যাক, উইলিয়াম কেরি এ দেশে আসিলেন না, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হইল না, বিদ্যাসাগর জজপণ্ডিতি করিতে ত্রিপুরায় চলিয়া গেলেন। তাহা হইলেও কি বর্তমান গদ্যধারা গড়িয়া উঠিত? মনে হয়, না। অন্তত বর্তমান আকারে নয় যে, তাহা তো বটেই। অথচ ইতিমধ্যে কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া একটা বিরাট কর্মবহুল সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে, কাজের তাগিদে ছোট ছোট গদ্যের ঝরনা বহিতেছে, এমন অবস্থায় বাংলা গদ্যের সূত্রপাত হইলে সে গদ্য অনেক পরিমাণে দেশের প্রকৃতিস্থ হইত। একটা আশঙ্কা এই ছিল যে, বাংলা গদ্যের বিবর্তনে আমরা আজ যেখানে পৌঁছিয়াছি তাহার অনেক পিছনে পড়িয়া থাকিতাম। এখনো হয়তো বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে পড়িয়া থাকিতাম, অবশ্য সে বঙ্কিমচন্দ্রও আমাদের পরিজ্ঞাত বঙ্কিমচন্দ্র নন।

গদ্য কর্মবহুল সমাজের ভাষা। বাঙালি সমাজ যথেষ্ট পরিমাণে কর্মবহুল হইয়া উঠিবার আগেই বাংলা গদ্য গড়িয়া উঠিয়াছে, যদিচ সে গদ্যের মূলেও ছিল কর্মের তাগিদ। কেরির বাইবেল অনুবাদ করিবার

আগ্রহ, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যগ্রন্থের চাহিদা, রামমোহনের বাদানুবাদের প্রবৃত্তি— এইসব কারণ, বিশেষ ব্যাবসাবাণিজ্যের ব্যাপকতা, সমাজের এমন অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারিত যে-অবস্থাকে ভিত্তি করিয়া প্রতিভাবানের কলম যথার্থ দেশজ গদ্যধারার সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইত। কিন্তু ইহাতেও আমাদের প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল না। দেশজ গদ্যের কি মূর্তি হইত? অনেকে বলিবেন, কেন, লোকের কথিত ভাষার উপরে গদ্যের প্রতিষ্ঠা হইলে আমরা যাহাকে কথ্য ভাষা বলিয়া জানি তাহারই উদ্ভব হইত, কিংবা একমাত্র কথ্যভাষাই ঘরনী হইত, সপত্নী সাধুভাষাকে লইয়া ঘর করিতে গিয়া অনবরত কলহের সৃষ্টি করিতে হইত না।

কিন্তু কথ্যভাষা বলিতে কি বুঝি? আলালী ভাষা, রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরের ভাষা, না বীরবলী ভাষা? এইগুলিই সাহিত্যিক কথ্যভাষার নমুনারূপে উল্লিখিত হইয়া থাকে। আলালের ভাষা আজ অপ্রচলিত এবং দুরূহ, তুলনায় সীতার বনবাস অনেক বেশি আধুনিক ও সুবোধ্য। ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ত রূপ ছাড়া কথ্যভাষার আর কোনো লক্ষণ ঘরে বাইরের ভাষায় ও বীরবলী ভাষায় আছে কি না সন্দেহ। বস্তুত যে গদ্য কখনো গড়িয়াই উঠে নাই তাহার আদর্শ পাওয়া যাইবে কি করিয়া। তবু তাহার একটা আভাস পাওয়া কঠিন নয়। আমার ধারণা, বিবেকানন্দের চিঠিপত্রে, যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধির রেঢ়ো টান বিশিষ্ট বাঁকা বাংলায়, অবনীন্দ্রনাথের খেয়ালী রচনায় এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রচনায়, যে গদ্য হইতে পারিত অথচ হয় নাই, তাহারই একটা ছায়া পাওয়া যায়। পাছে কেহ ভুল বোঝেন, তাই বলিয়া রাখি, গদ্যলেখক হিসাবে কাহাকেও ছোট বা বড় করিবার বা কাহারও স্থাননির্ণয়ের উদ্দেশ্যে এ কথা বলিতেছি না।

২

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষার স্বকীয়তা তাঁহার বেনের মেয়ে (১৯২০) উপন্যাসে এবং শেষের দিকে লিখিত প্রবন্ধাদিতে সবচেয়ে পরিস্ফুট। তাঁহার কাঞ্চনমালা (১৯১৬) ও বাল্মীকির জয় (১৮৮১) প্রথমদিকের রচনা, দুখানিই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল, বাল্মীকির জয় ১২৮৮ (১৮৮১) সালে, আর কাঞ্চনমালা ১২৮৯ (১৮৮২-৮৩) সালে। দুখানি গ্রন্থের ভাষাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব আছে, কাঞ্চনমালার কাহিনীবিন্যাসে তো আছেই। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব কি ভাষায়, কি কাহিনীর টেকনিকে কাটাইয়া উঠিতে তাঁহাকে অনেক চেষ্টা করিতে হইয়াছে। বেনের মেয়ে ১৩২৫ (১৯১৮–১৯) সালে নারায়ণে প্রকাশিত। ভাষা তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব, যদিচ কাহিনীবিন্যাসের রীতিতে কোথাও কোথাও বঙ্কিমচন্দ্রীয় টেকনিক দৃষ্ট হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার সহিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষার মিল ও অমিল দুইয়ের কথা বলা হইল, বঙ্কিমচন্দ্রের রীতি হইতে তাঁহার স্বকীয় রীতির বিবর্তনের ইঙ্গিতও দেওয়া হইল, তৎসত্ত্বেও এক জায়গায় একেবারে গোড়া ঘেঁষিয়া দুই জনের ভাষায় ঐক্য আছে। দুইজনেরই ভাষা মূলত যুক্তিসিদ্ধ মনের ভাষা। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে প্রচুর-পরিমাণে কবিত্বরস আছে, তৎসত্ত্বেও তাঁহার মন মূলত নৈয়ায়িকের মন। সে কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার চরম উৎকর্ষ তাঁহার উপন্যাসগুলিতে নয়, তাঁহার প্রবন্ধাবলীতে এবং কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে। শেষোক্ত শ্রেণীর রচনায় তাঁহার নৈয়ায়িক মন স্বভাবসিদ্ধ স্থানটি লাভ করিয়াছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মনও নৈয়ায়িক মন, যদিচ বাল্মীকির জয় এবং বেনের মেয়ে গ্রন্থদ্বয়ে কল্পনার অবকাশ সুপ্রচুর।

রবীন্দ্রনাথের মন মূলত কল্পনাপন্থী। প্রচুর কল্পনার জোগান না

থাকিলে রবীন্দ্রনাথের স্টাইলকে অনুসরণ বিপদের কারণ হইয়া পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের নৈয়ায়িক স্টাইল পদচারী পথিক, তাহাকে অনুসরণ কঠিন নহে। অক্ষয় সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাহাকে অনায়াসে অনুসরণ করিয়াছেন। হরপ্রসাদ শেষপর্যন্ত স্বকীয়তায় পৌঁছিয়াছেন, অক্ষয় সরকার ও চন্দ্রনাথ বসু সম্বন্ধে সে কথা প্রযোজ্য না হইলেও তাঁহাদের গ্রন্থে ভাষাগত মুদ্রাদোষ দেখা দেয় নাই। কল্পনার সম্বল না লইয়া যাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করিতে গিয়াছেন, তাঁহাদের কয়জনের সম্বন্ধে এমন কথা সাহস করিয়া বলা যায়।

এখানে আর-একটা জটিল সমস্যা আসিয়া পড়িল, নৈয়ায়িকের মন আর কল্পনাপন্থীর মন। বাঙালি সমাজের সমষ্টিগত মনে এই দুইটি উপাদানই আছে, বাঙালি নৈয়ায়িকও বটে, আবার কল্পনাপ্রবণও বটে। যে বাঙালি নব্যন্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছে, সেই বাঙালিই বৈষ্ণব পদাবলী লিখিয়াছে— বাংলাদেশের মানসচিত্রে ভট্টপল্লী ও নান্নুর-কেন্দুলি পাশাপাশি অবস্থিত। কাঁঠালপাড়া হইতে ভাটপাড়া অধিক দূর নহে, নৈহাটি হইতে ভাটপাড়া আরও কাছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী খুব সম্ভব নৈয়ায়িক-বংশের সন্তান।

আগে বাংলা সাহিত্যের মুখ্য ভাষা সম্বন্ধে একটা কল্পনার অবতারণা করিয়াছি। বর্তমান প্রসঙ্গ অবলম্বনে আর-একটা জল্পনার সূত্রপাত করা যাইতে পারে। এ দেশের রাজা ইংরেজ না হইয়া ফরাসি হইতে পারিত, এক সময়ে সে সম্ভাবনা ছিল। তেমন ঘটিলে বাংলা সাহিত্য কি আকার লাভ করিত? ইংরেজি সাহিত্য কল্পনাপ্রবণ, তাহাতে কাব্যটাই প্রবল; ইংরেজি গদ্য কল্পনাপ্রবণের গদ্য, সে গদ্য মূলত কাব্যধর্মী। এমন যে ইংরেজি সাহিত্য, তাহার প্রভাবে বাঙালি মনের কল্পনাপ্রবণ উপাদানগুলি জোর পাইয়াছে, বাঙালির কাব্য যেমন সতেজ হইয়া উঠিয়াছে গদ্য তেমন হইতে পায় নাই; বরঞ্চ ইংরেজি গদ্যের

কাব্যধর্ম বাংলা গদ্যে সংক্রামিত হইয়া গিয়াছে। বাংলার নৈয়ায়িক মন ইংরেজি সাহিত্যের কাছে প্রশ্রয় পায় নাই। ফরাসি জাতি এ দেশের রাজা হইলে ফরাসি সাহিত্যের প্রভাবে ইহার বিপরীত প্রক্রিয়াটা হইত মনে করিলে অন্যায় হইবে না। ফরাসি সাহিত্য যুক্তিপন্থী, তাহার গৌরব গদ্য। ফরাসি কাব্য গদ্যধর্মী, অর্থাৎ যুক্তির পথ ছাড়িয়া সে কাব্য অধিকদূর যাইতে সম্মত নয়। কর্নেই ও রাসিনের নাটক নৈয়ায়িক মনের কাব্য। ব্যাপকভাবে ফরাসি সাহিত্যের প্রভাব বাংলাদেশের উপরে পড়িলে বাঙালির নৈয়ায়িক মন সমর্থন পাইত, কাব্যাংশে বাংলা সাহিত্য তেমন সমৃদ্ধ হইত কি না জানি না। তবে এ কথা নিশ্চয় যে, বাংলা গদ্য একপ্রকার স্বচ্ছতা সরলতা ঋজুগতি ও দীপ্তি লাভ করিত, বর্তমান বাংলা গদ্যে যাহার একান্ত অভাব। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কলমে যে গদ্য বাহির হইয়াছে, যে গদ্যকে বাংলা গদ্যের নিয়ম না বলিয়া নিয়মের ব্যতিক্রম বলাই উচিত, সেই ধারাটাই বাংলা গদ্যসাহিত্যের রাজপথ হইয়া উঠিত। এখন শাস্ত্রী মহাশয়ের বসতি বাংলা সাহিত্যের একটি গলিতে, বিধাতার অভিপ্রায় অন্যরূপ হইলে সেটা বড় সড়কের উপরে হইতে পারিত। ডুপ্লের কূটনীতির জয় হইলে ভট্টপল্লী বাঙালি মনের রাজধানী হইতে পারিত। কিন্তু এসব জল্পনা বোধ করি নিরর্থক; হয়তো এইটুকু অর্থ ইহাতে আছে যে, বাঙালি মনের গতিবিধি এবং প্রসঙ্গক্রমে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর স্টাইলের একটা ইঙ্গিত ও পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে।

৩

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর স্বকীয় স্টাইলের নমুনারূপে বেনের মেয়ে হইতে দুইটি অংশ তুলিয়া দিতেছি। প্রথমটিতে তারাপুকুরের একটি জলাশয়ে মাছ-ধরার বর্ণনা—

ক্রমে জাল তারাপুকুরের মাঝামাঝি আসিয়া পৌঁছিল। তখন সূর্যদেবের রাঙা কিরণও আসিয়া তারাপুকুরের জল সোনার রং করিয়া দিল। কিন্তু এ কি? জাল যে আর টানা যায় না। জালের তলায় এত মাছ পড়িয়াছে যে, দুই নৌকার জেলেরাই জাল টানিয়া উঠাইতে পারিতেছে না। তখন জালের দড়ি নোল করিয়া দেওয়া হইল। কতকগুলি মাছ ঘাই দিয়া লাফাইয়া জালের পিছনে গিয়া পড়িল। তাহারা যখন লাফায়, তখন বোধ হইতে লাগিল যেন রূপার মাছ-বৃষ্টি হইতেছে। মাছগুলা রূপার মত সাদা, মাজা রূপার মত চক্‌চকে, একটার পর আর একটা পড়িতেছে। চক্‌চকে রূপার রঙের উপর সূর্যের সোনালি রং পড়িয়া গিয়াছে। সে রঙের মেশামিশিতে এক অপূর্ব শোভা। জাল হালকা হইল, আবার জালটানা আরম্ভ হইল। ক্রমে জাল আসিয়া অপর পারে পৌঁছিল। এইবার জাল গুটান আরম্ভ হইল। মাছেদের এইবার মরণ-কামড়। যত জাল গুটাইয়া আনিতে লাগিল, তাহাদের লাফালাফি ততই বাড়িতে লাগিল। রূপার ঝকঝকানিও ক্রমে উজ্জ্বল, উজ্জ্বলতর, উজ্জ্বলতম হইয়া আসিল। ক্রমে তারাপুকুর যেন একপেশে হ'য়ে দাঁড়াইল। পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ পাড়ে কোথাও লোক নাই। যেখানে জাল সেইখানেই লোক। একদিকে যেমন মাছের ঘপঘপানি, আর একদিকে তেমনি লোকের কলরব।

দ্বিতীয় বর্ণনাটি গাজনের শোভাযাত্রার। হাতির উপরে রাজগুরু ও গুরুপুত্র চাপিয়াছেন, তাঁহাদেরও দেখিতে পাইব—

তিনটার সময়ে রাজবাড়ীতে গাজনের সাজন হইল। মূল সন্ন্যাসীর মাথা নেড়া, লম্বা দাড়ী, গোঁপ কামান, গায়ে আলখাল্লা, তাঁহার গায়ে ছোট ছোট নানা রঙের রেশমের, পাটের, বাকলের টুকরা লাগান। তাঁহাকে রাজা আসিয়া নমস্কার করিলেন এবং

তাঁহার হাত ধরিয়া একটা প্রকাণ্ড হাতীর হাওদায় তুলিয়া দিলেন। খুব সাজানো একটা হাতী, সর্বাঙ্গে শিঙ্গার করা, বড় বড় রাঙা রাঙা শাদা শাদা কাল কাল ডোরা দেওয়া, তাহার উপর কিংখাপের হাওদা, হাওদার চারিদিক দড়ি দিয়া ঘেরা, খুব জাঁকাল, খুব জমকাল। রাজা গুরুদেবকে সেই হাতীতে চড়িতে ও সেই হাওদায় বসিতে বলিলেন। ক্রমে হাতী আসিয়া গুরুদেবের পদতলে উপুড় হইয়া পড়িল ও শুঁড় দিয়া তাহার পদসেবা করিতে লাগিল। হাতীর পিঠে একটা সিঁড়ি লাগিল, সেই সিঁড়ি বাহিয়া গুরুদেব হাতীতে উঠিলেন। তাঁহার সহিত একটা ছোকরা, তেমন স্থন্দর ছেলে দেখা যায় না, যেন সত্য সত্যই রাজপুত্র ; মাথাটি মুড়ান, বোধহয়, প্রায়ই খেউরি করা হয়, গোঁপ নাই, দাড়িও নাই। রংটি যতদূর ধব্‌ধবে হইতে পারে ; চোখ ছুটি পটল-চেরা ; ঠোঁট ছুটি পাতলা অথচ লাল, গাল ছুটি বেশ গোল-গাল, দাড়িটি ক্রমে সরু হইয়া ছুঁচাল হইয়া গিয়াছে, কপালখানি ছোট, কম চওড়া ; ছুই রগের দিকে চুলগুলি একবার ভিতরের দিকে ঢুকিয়া আবার বাহিরে আসিয়া কোণ করিয়া কানের কাছে জুলপি হইয়া গিয়াছে।

এই ভাষাকেই আমরা মুখ্য ভাষার আদর্শ বলিতেছি। প্রথম লক্ষণীয়, ইহার ক্রিয়াপদগুলি সংক্ষিপ্ত নয়। অনেকের ধারণা, খেয়ালের ডাণ্ডা মারিয়া ক্রিয়াপদগুলির হাড়গোড় ভাঙিয়া দিলেই সাধুভাষা কথ্যভাষা হইয়া দাঁড়ায়। ইহাতে সেরূপ অপচেষ্টা নাই, তবু ইহা মুখ্য ভাষা, যেহেতু ইহার বিন্যাস এমন যে, সাধারণ কথাবার্তা বলিতে যেটুকু নিশ্বাস-প্রশ্বাসের জোর দরকার ইহাতে ততোধিক জোরের প্রয়োজন হয় না। বিশ্রম্ভালাপের সময় কথা বলিতেছি এ চৈতন্য সব সময় হয় না, এই গদ্য পাঠকালেও প্রায় সেই রকম অবস্থা। ইহাতে তৎসম, তদ্ভব ও খাঁটি দেশি শব্দ কেমন স্থকৌশলে মিশ্রিত, খাপে-খাপে খোপে-খোপে

কেমন জোড়া লাগিয়া গিয়াছে। ইহার তুলনায় আলালী ভাষা গ্রাম্য, বীরবলী ভাষা কৃত্রিম। এ ভাষা শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই অনায়াসে বুঝিতে পারে। খাঁটি সংস্কৃতর সঙ্গে খাঁটি দেশির মেলবন্ধন সামান্য প্রতিভার লক্ষণ নয়। মুখ্যভাষা রচনায় সেই প্রতিভার আবশ্যক। সেই প্রতিভা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীতে অসামান্য রকম ছিল।

৪

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচিত রসসাহিত্য বলিতে বাল্মীকির জয়, কাঞ্চন-মালা এবং বেনের মেয়ে এই গ্রন্থ-তিনখানিকে বুঝি। তাঁহার প্রবন্ধাদির বিশেষ মূল্য থাকিলেও সেগুলি বর্তমান প্রবন্ধের পরিধির অন্তর্গত নয়।

বাল্মীকির প্রতিভার স্ফুরণ এবং সেই প্রতিভার প্রভাবে বিশ্বে ভ্রাতৃভাবের উদয় বাল্মীকির জয় গ্রন্থের বিষয়। আদিকবিকে অবলম্বন করিয়া কিছু লিখিবার ইচ্ছা লেখকমাত্রেরই পক্ষে স্বাভাবিক। বাংলা সাহিত্যে আদিকবিকে কেন্দ্র করিয়া দুখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে— রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকিপ্রতিভা ও হরপ্রসাদের বাল্মীকির জয়। দুখানি গ্রন্থই প্রায় সমকালে লিখিত। রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকি-প্রতিভার প্রথম প্রকাশ ১৮৮১ সালের ফাল্গুন মাসে; বাল্মীকির জয়ের প্রথম প্রকাশ ১৮৮১ সালের ডিসেম্বর মাসে, তৎপূর্বে ১২৮৮ (১৮৮১) সালের পৌষ মাঘ ও চৈত্র সংখ্যার বঙ্গদর্শনে ইহা আংশিক প্রকাশিত হইয়াছিল।

সমকালে ভূমিষ্ঠ গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে কে কাহার কাছে ঋণী বলা সহজ নয়, তবে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে বাল্মীকির জয়ের যে বিশদ আলোচনা করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি বলিতেছেন যে—

> যাঁহারা বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাল্মীকিপ্রতিভা পড়িয়াছেন বা তাহার অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা কবিতার জন্মবৃত্তান্ত কখনো

ভুলিতে পারিবেন না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ-বাবুর অনুগমন করিয়াছেন।

হরপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের অনুগমন করিলেও বাল্মীকির জয়ে তাঁহার কল্পনার বিশেষ স্ফূর্তি হইয়াছে, ব্রহ্মাণ্ডসঞ্চারী কল্পনার গতি বাল্মীকির জয়ে সমধিক বলিয়াই মনে হয়।

বাল্মীকির জয় আলোচনা করিতে বসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র এক বিপদে পড়িয়াছিলেন, তিনি ইহার শ্রেণীনির্ণয় করিতে পারেন নাই। ইহা কোন্ শ্রেণীর গ্রন্থ? ইহা উপন্যাস নয়, নাটক নয়, কাব্য নয়, জীবনী নয়, ইহাকে বৈজ্ঞানিক নিবন্ধও বলা যায় না, এমনকি ইহাকে পুরাণ বলিয়াও স্বীকার করেন নাই। কিন্তু আমাদের মনে হয় গ্রন্থের যদি শ্রেণীনির্ণয় করিতেই হয়, তবে বাল্মীকির জয়কে এক অভিনব পুরাণ বলিয়াই গ্রহণ করা উচিত। পুরাণ একপ্রকার ইতিহাস। একপ্রকার এই কারণে যে, বর্তমানে ইতিহাস বলিতে যাহা বুঝি পুরাণ সে শ্রেণীর ইতিহাস নয়। বর্তমান ইতিহাস 'পাথুরে প্রমাণ' ছাড়া কিছু স্বীকার করে না, পুরাণকারগণ যাবতীয় তথ্যকেই গ্রন্থভুক্ত করিতেন। এই বিচারে থুকিডাইটিস্ ঐতিহাসিক আর হেরোডোটাসের গ্রন্থ পুরাণ। বাল্মীকির জয় শেষোক্ত শ্রেণীর গ্রন্থ।

গ্রন্থের বক্তব্য কি? আবার বঙ্কিমচন্দ্রের শরণাপন্ন হইতে হইল। তিনি বলিতেছেন—

ভালো, গ্রন্থের জাতিনির্বাচন করিতে না পারি, এক রকম পরিচয় দিতে পারিব। গ্রন্থকার নিজে টাইটেল পেজে একপ্রকার পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। লিখিয়াছেন The Three Forces—Physical, Intellectual and Moral। ইংরেজি ভাষার শপথ করিতেছি, যদি ইহার কিছু বুঝিয়া থাকি। Force তো দেখিলাম না, দেখিলাম কেবল তিনটি বিরাট মূর্তি, বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র বাল্মীকি।

গ্রন্থকার ও সমালোচক দুজনের কথাই সত্য। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ছিল একটি কাহিনী ও তিনটি চরিত্র অবলম্বন করিয়া/ তিনটি forceএর লীলা বর্ণনা করিবেন, কিন্তু কার্যত সেই লীলা প্রদর্শন কতদূর সত্য হইয়াছে জানি না, মূর্তি তিনটি একান্ত বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে; ভালোই হইয়াছে, যাহা নীরস প্রবন্ধ হইবার কথা, তাহা সরস আলেখ্য হইয়া দেখা দিয়াছে।

গ্রন্থকার বলিতে চান যে, বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র ও বাল্মীকি তিন জনে বিশ্বে সমতা ও ভ্রাতৃভাব আনিতে চাহিয়াছিলেন। বশিষ্ঠের সহায় জ্ঞান, বিশ্বামিত্রের সহায় বাহুবল, আর বাল্মীকির সহায় প্রীতি। জ্ঞানে মানুষকে এক করিতে পারে না, স্বতন্ত্র করিয়া দেয়; বাহুবলে মনের সঙ্গে মনের জোড় বাঁধিতে পারে না, পরাধীন করিয়া পিণ্ডীকৃত করিয়া রাখিতে পারে—তাহা মনের মিলন নয়, বরঞ্চ বিজিত ও বিজেতার মধ্যে গোপন বিদ্বেষের সৃষ্টিকারক। কেবল প্রীতিই মানুষের সঙ্গে মানুষকে মনের মিলনে গাঁথিয়া এক করিয়া তুলিতে পারে। মানুষে মানুষে মিলন ঘটাইবার ইহাই একমাত্র উপায়। এই উপায় অবলম্বন করিবার ফলেই বাল্মীকির জয় আর বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের ব্যর্থতা।

কিন্তু এই নীতি বিশ্লেষণে বাল্মীকির জয়ের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হইল না। আবার বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণ করিব। তিনি এই বইখানি সম্বন্ধে বলিতেছেন—

> যেমন কল্পনা, তেমন বর্ণনা।· ·ভাষা সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে, কিন্তু আমরা এই গ্রন্থের বাংলাকে উৎকৃষ্ট বাংলা বলি।· · গ্রন্থখানি অতি ক্ষুদ্র কিন্তু গ্রন্থখানি বাংলা ভাষায় একটি উজ্জ্বলতম রত্ন। আর কোনো বাংলা গ্রন্থকার এত অল্প বয়সে এরূপ প্রতিভা ও মানসিক শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, এমন আমাদের স্মরণ হয় না।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তির পরিবর্তনের প্রয়োজন উপস্থিত হয় নাই

তবে যে বাল্মীকির জয় অধুনা উপেক্ষিত, তার কারণ সাময়িকভাবে বাঙালির সাহিত্যিক রুচিবিকৃতি ঘটিয়াছে। এই রুচিবিকারের অন্তে বাল্মীকির জয় তাহার যথার্থ আসন লাভ করিবে সন্দেহ নাই।

৫

কাঞ্চনমালা ও বেনের মেয়ে উপন্যাস। পুরাতত্ত্ববিদ্ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ যে এক সময়ে উপন্যাস লিখিয়াছিলেন এ কথা আধুনিক যুগ ভুলিতে বসিয়াছে। কাঞ্চনমালা লিখিত হয় তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের প্রারম্ভে, ১২৮৯ সালে। আর বেনের মেয়ে ১৩২৫ সালের কার্তিক হইতে ১৩২৬ সালের অগ্রহায়ণ পর্যন্ত নারায়ণ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাকে তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের শেষাংশের রচনা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই সময়ের মধ্যে তিনি রসসাহিত্যের পথ পরিত্যাগ করিয়াছেন, ভারতবিখ্যাত পুরাতাত্ত্বিকরূপে স্বীকৃত হইয়াছেন। তবু বেনের মেয়ের রচনা দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, পাথুরে প্রমাণের আঘাতে তাঁহার সাহিত্যের কলম ভোঁতা হইয়া যায় নাই, বরঞ্চ আরও শক্তিমান হইয়া উঠিয়াছে। উপন্যাসরচনায় পুরাতত্ত্বের জ্ঞান তাঁহার সহায় হইয়াছে, পাথরের চাপে মাটির শ্যামল তৃণদল শুকাইয়া মরিয়া যায় নাই।

কাঞ্চনমালা মহারাজা অশোকের পুত্র কুণালের পত্নী। কাঞ্চনমালা উপন্যাস তিষ্যরক্ষিতা কর্তৃক নিগৃহীত কুণাল ও কাঞ্চনমালার কাহিনী। কাহিনীর স্থল সেকালের পাটলিপুত্র ও তক্ষশিলা। ব্রাহ্মণ্যশক্তির সহিত বৌদ্ধশক্তির সংঘাত এবং শেষোক্ত শক্তির জয় এই কাহিনীর বৃহত্তর বিষয়, যেমন বাল্মীকির জয় তন্নামখ্যাত গ্রন্থের বিষয়, যেমন ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদের যুদ্ধ এবং ব্রাহ্মণগণের জয় বেনের মেয়ে উপন্যাসের বৃহত্তর বিষয়। এই রকম কোনো একটা ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক সূত্র অবলম্বন করিয়া

রচনা করিতে হরপ্রসাদ যেন ভালোবাসিতেন, খুব সম্ভব তাঁহার অসাধারণ পুরাতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান ও প্রতিভা যেন একটা আশ্রয় পাইত। যে কারণেই হোক আলোচ্য তিনখানি গ্রন্থেই এই একই পন্থা দেখিতে পাই।

কাঞ্চনমালা কাঁচা গ্রন্থ; ইহার ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের, ইহার কাহিনী-বিন্যাসের রীতিও বঙ্কিমচন্দ্রীয়; আবার বাল্মীকির জয়ে যে চিন্তার স্বকীয়তা আছে এখানে তাহারও অভাব। তার উপরে সমসাময়িক যে তথ্যজ্ঞান বেনের মেয়েকে সত্য ও প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিয়াছে, কাঞ্চনমালায় তাহাও পাই না। তবে বিষয়নির্বাচনে লেখকের দৃষ্টির বাহাদুরি দেখিতে পাই। কুণালের তথা বৌদ্ধশক্তির জয় বর্ণনা করিয়া লেখক বলিতেছেন—

> এই দিবস যে কার্য হইল তাহার বলে একহাজার বৎসর ভারত বৌদ্ধ ছিল। সশস্ত্র এশিয়া এই দিনের কার্যবলে বৌদ্ধধর্ম আশ্রয় করে।

এই দৃষ্টি জন্ম-ঐতিহাসিকের দৃষ্টি। যাঁহারা হরপ্রসাদকে সাহিত্যিক বলিয়া স্বীকার করিবেন না, তাঁহাদেরও সাহস নাই যে তাঁহাকে ঐতিহাসিক না বলেন। তবে 'পাথুরে প্রমাণে' তাঁহার তত আস্থা ছিল না। ভাগ্যে ছিল না, তাই পাথর কুঁদিয়া তিনি বেনের মেয়ের মূর্তি সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।

৬

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী হাজার বছরের পুরানো বাংলা ভাষার নমুনা আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি আরও করিয়াছেন। হাজার বছরের পুরানো বাংলা সমাজের নমুনা আবিষ্কার করিয়াছেন। বেনের মেয়ে হাজার বছরের পুরানো বাংলাদেশের সামাজিক উপন্যাস। তখন রূপা-বাগ্‌দী

> মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর পরম ভট্যারক পরম সৌগত শ্রীশ্রী ১০৮ রূপনারায়ণ সিংহ উপাধি লইয়া প্রবল প্রতাপে সাতগাঁ সহর ও সপ্তগ্রাম ভুক্তি শাসন করিতেছেন।

সে সহজযানভুক্ত বৌদ্ধ। সপ্তগ্রামে বৌদ্ধ রাজ্য। গাজনের উৎসব উপলক্ষে রাজগুরু সিদ্ধাচার্য লুইপাদ সাতগাঁয়ে আসিয়াছেন। এই লুইপাদের রচিত দোঁহা আছে, সেগুলিও হরপ্রসাদের আবিষ্কৃত। সাতগাঁয়ে ব্রাহ্মণ আছে, তবে তাহাদের প্রতাপ নাই। প্রতাপ আছে বেনেদের। বেনেদের বড় দব্‌দবা। তাহারা সমুদ্র পার হইয়া নিজেদের অর্ণবপোতে দেশবিদেশে যায়, বিদেশের লক্ষ্মীকে ঘরে আনে। এই বেনে-সমাজের শ্রেষ্ঠ বিহারী দত্ত। তাহার মেয়েই এই কাহিনীর নায়িকা। বেনেরা বৌদ্ধ নয়, কিন্তু তাহাদের ঐশ্বর্যের খাতিরে বৌদ্ধ রাজা তাহাদের ভয় করিয়া চলে। এই কাহিনী সম্বন্ধে লেখক মুখপাতে বলিতেছেন—

> বেনের মেয়ে ইতিহাস নয়, সুতরাং ঐতিহাসিক উপন্যাসও নয়। কেননা, আজকালকার 'বিজ্ঞানসংগত' ইতিহাসের দিনে পাথুরে প্রমাণ ভিন্ন ইতিহাসই হয় না। আমাদের রক্তমাংসের শরীর, আমরা পাথুরে নই, কখনো হইতেও চাই না। বেনের মেয়ে একটা গল্প। অন্য পাঁচটা গল্প যেমন আছে, এও তাই। তবে এতে এ কালের কথা নাই। সব সেই কালের, যে কালে বাঙালির সব ছিল। বাংলার হাতী ছিল, ঘোড়া ছিল, জাহাজ ছিল, ব্যবসায় ছিল, বাণিজ্য ছিল, শিল্প ছিল, কলা ছিল।

লেখক ইহাকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেন নাই, আমরাও নাই বলিলাম। তবে ইহাকে সামাজিক উপন্যাস বলিতে ক্ষতি দেখি না। তবে এক হিসাবে ইহা ইতিহাসেরও বাড়া, যেহেতু হাজার বছরের পুরানো বাঙালি সমাজের যে চিত্র ইহাতে আছে তাহা কোনো ইতিহাসে বা ঐতিহাসিক উপন্যাসে নাই। সে যুগটা বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে বৌদ্ধ প্রভাবের শেষ সময়। এই গ্রন্থেই দেখিতে পাইব বেনেদের ষড়যন্ত্রে বা সাহায্যে বৌদ্ধ প্রভাব দূরীভূত হইয়া ব্রাহ্মণ্য প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত

হইল। বেনেরা হিন্দুসমাজের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকৃত হইল। যাহারা ব্রাহ্মণদের প্রভাব স্বীকার করিল তাহারা 'জল-চল' জাতি হইল, যাহারা স্বীকার করিল না তাহাদের জল অনাচরণীয় হইয়া রহিল। হরপ্রসাদ এই যুগ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি যে সামাজিক ও ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ সংগ্রহ করিয়াছেন, বেনের মেয়ে উপন্যাসে সেসব কাজে লাগিয়া গিয়াছে। কাজেই তাঁহার বর্ণিত বিষয়গুলিকে অলীক মনে করা উচিত হইবে না, বিশেষজ্ঞের সাক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করাই সংগত। সেকালের যুদ্ধের বর্ণনায় এক জায়গায় তিনি বারুদের উল্লেখ করিয়াছেন। হাজার বছর আগে বারুদের ব্যবহার ছিল কি না জানি না। কিন্তু এই একটি দৃষ্টান্ত ছাড়া আর কোথাও অসংগতি চোখে পড়ে নাই।

রমেশচন্দ্র দত্তের ঐতিহাসিক উপন্যাস ইতিহাসের রাজপথ। বড় বড় বীর, রাজপুরুষ, ইতিহাসবিখ্যাত ব্যক্তিদের সেখানে ভিড়। বেনের মেয়ে ইতিহাসের গলিঘুঁজি। হরপ্রসাদ আর-সকলের অজ্ঞাত গলিপথে সেকালে অখ্যাতদের রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়িয়া তাহাদের হাঁড়ির খবর একালের গোচর করিয়া ছাড়িয়াছেন। সেই বিস্মৃত কালের সামাজিক আবহাওয়া-সৃষ্টিতেই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। এক সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অসমাপ্ত উপন্যাস ডঙ্কানিশান হিসাবে না আনিলে, এ বিষয়ে বেনের মেয়ের জুড়ি নাই ; আর জুড়ি না থাকিলে অনেক সময়ে যেমন হয় তাহাই হইয়াছে, এই কাহিনীটি সম্পূর্ণ অনাদৃত। গ্রন্থাবলী সিরিজে ইহা দুর্লভ হইয়া আছে, এ সংবাদ বাঙালি রসিকের পক্ষে গৌরবের নয়। গ্রন্থাকারে সুলভ হইয়া বাঙালির ঘরে ঘরে ইহা বিরাজ করিবার যোগ্য, স্কুল-কলেজে ইহা পঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, ইহা একাধারে ইতিহাস ও রস-সাহিত্য। আর আজকার দিনে যাঁহারা সাহিত্যে সমাজচৈতন্য চান, তাঁহারা ইহাতে পেট পুরিয়া সমাজচৈতন্য পাইবেন। দেখিতে পাইবেন যথার্থ সমাজচৈতন্য কি বস্তু এবং কেমনভাবে তাহাকে সরস করিয়া তুলিতে হয়।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। একটা ছেলেভুলানো ছড়া বাংলাদেশের সবাই জানে—

আগ ডোম বাগ ডোম ঘোঁড়া ডোম সাজে
ডান মৃগল ঘাঘর বাজে।
বাজতে বাজতে পড়লো সাড়া,
সাড়া গেল বামন পাড়া।

এই প্রাচীন ছডাটির অর্থ কেহ জানে কি? সকলেই নিরর্থক মনে করিয়া বকিয়া যায়। কিন্তু ইহাতে সেকালের ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ বিবাদের চিহ্ন যে বর্তমান, ইহা যে জীবন্ত 'সমাজচৈতন্য', হরপ্রসাদের বেনের মেয়ে পড়িবার আগে জানিতাম না। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বৌদ্ধদের যুদ্ধ আসন্ন। রাজা হুকুম দিলেন 'সব বাগ্‌দী সাজো।' বাগ্‌দীরা কেবল লড়ে। কিন্তু রাস্তা তৈয়ার করা, শত্রুর গতিবিধি দেখা ডোমদের কাজ, আর ঘোড়সোয়ারও ডোম, দশ হাজার বাগ্‌দী সাজিলে সঙ্গে সঙ্গে পাঁচহাজার ডোমও সাজিল। তাহারা আগে গিয়া রাস্তা দেখিতে ও তৈয়ার করিতে লাগিল, বাজনা বাজাইতে লাগিল। ঘোড়ায় চড়িয়া দেশের অবস্থা দেখিতে লাগিল। গান উঠিল 'আগ ডোম বাগ ডোম ঘোঁড়া ডোম সাজে' ইত্যাদি। ডোমদের সাড়া বামনপাড়ায় গেলে তাহারা ভারি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল।

এবার ছেলেভুলানো ছড়াটির অর্থ কি স্পষ্ট হইয়া উঠিল না? এখন আর ইহাকে নিরর্থক ছড়া মনে হইবে না, ইতিহাসের নজির মনে হইবে। ইহাই সমাজচৈতন্যের যথার্থ সাহিত্যিক রূপ। কতকগুলা ঘটনার বিবরণ সমাজচৈতন্য নয়, তাহার জন্য সংবাদপত্র আছে।

বৌদ্ধরাজ্য নাশ হইল এবং হরিবর্মার হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। হরিবর্মা স্থির করিলেন গোটা ভারতবর্ষের গুণীজ্ঞানীদের ডাকিয়া এক সভা করিবেন এবং তাহাদের যথাযোগ্য পুরস্কার দান করিবেন।

হরিবর্মার দূত ভারতবর্ষের গুণিসমাজকে নিমন্ত্রণ করিতে বাহির হইল। তাঁহার দূত মুঙ্গের পাটনা নালন্দা রাজগির ওদন্তপুরী বুদ্ধগয়া প্রভৃতি পার হইয়া কাশী হইয়া কনৌজ পর্যন্ত পৌঁছিল। সেখানে গিয়া শুনিতে পাইল যে, মুসলমানে ভারত আক্রমণ করিতে আসিতেছে, সবাই আসন্ন যুদ্ধের জন্য ব্যস্ত; সভা করিতে কাহারও মন হইবে না, রাজদূত বুঝিতে পারিল। ভারগ্রস্ত মন লইয়া রাজদূত ফিরিয়া আসিল। কয়েকটি পরিচ্ছেদে লেখক প্রাচীন ভারতের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জনপদগুলির বর্ণনা করিয়াছেন। সে বর্ণনা ঐতিহাসিকের বর্ণনা নয়, কারণ ঐতিহাসিক দেখে দূর হইতে একাল হইতে সেকালকে; এ বর্ণনা সেই শিল্পীর মানস-উদ্ভূত, ইতিহাসের জাহ্নবীকে যিনি গণ্ডূষে পান করিযাছেন। এ দেখা ভিতর হইতে দেখা, কাছে হইতে দেখা, সেই কালে গিয়া সেকালকে দেখা। এই পরিচ্ছেদ-কয়েকটিকে ইতিহাসের মেঘদূত বলা উচিত। এগুলি পড়িবার সময়ে লেখকের জ্ঞান ও বর্ণনাশক্তি মুগ্ধ করিয়া দেয়, মনে হয় হরিবর্মার দূতের তলপি বহিয়া আমরাও সঙ্গে চলিতেছি। বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, এ দেশে যাহারা লেখে তাহারা পড়ে না, আবার যাহারা পড়ে তাহারা লেখে না। হরপ্রসাদ তাহার ব্যতিক্রম। কাঞ্চনমালায় সে ব্যতিক্রম তেমন স্পষ্ট নয়। বেনের মেয়ে পাঠ করিলে বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই তাঁহার ভ্রম স্বীকার করিতেন।

৭

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সাহিত্যরচনার মূল প্রেরণা কোথা হইতে আসিল? নিছক আত্মপ্রকাশের প্রবৃত্তি হইতে তাহার উদ্ভব মনে হয় না। এই দেশকে, এই দেশের ঐতিহ্যকে তিনি নিগূঢ়ভাবে ভালোবাসিতেন। এই দেশের প্রাচীন কালের জটিল জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তাঁহার অগাধ জ্ঞান সেই ভালোবাসাকে একটা বাস্তব ভিত্তি দিয়াছিল। এই ভিত্তির উপরে

তাঁহার রসসাহিত্য প্রতিষ্ঠিত এবং ভালোবাসার বন্ধনে তাহা সুবিন্যস্ত বলিয়া মনে হয়। সার্ ওয়ল্টার স্কট রাজনৈতিক মতবাদে টোরি ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সুগভীর স্বদেশপ্রেম তৎকালীন কোনো অনলবর্ষী বিপ্লবী বা উদারনৈতিকের চেয়ে কম ছিল না, বরঞ্চ অনেকাংশে সত্যতর ছিল বলাই উচিত, যেহেতু স্কট বর্তমান কালকে অতিক্রম করিয়া যে ঐতিহাসিক কাল রহিয়াছে তাহাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিতেন। তাঁহার উপন্যাসগুলি একাধারে এই প্রীতি ও জ্ঞানের সমন্বয়ে গঠিত। হরপ্রসাদ সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। তাঁহার রাজনৈতিক মত কি ছিল জানি না, জানিবার প্রয়োজনও অনুভব করি না, কিন্তু তৎসত্ত্বেও কেবল তাঁহার রসসাহিত্যের সাক্ষ্যের বলেই বলিতে পারি যে, দেশের প্রতি, কেবল রাজনীতিকের বা অর্থনীতিকের দেশের প্রতি নয়, ব্যাপকতর ও গভীরতর অর্থে দেশের প্রতি তাঁহার অগাধ প্রেম ছিল, দেশের ঐতিহ্যের প্রতি অসীম আস্থা ও বিশ্বাস ছিল, এবং এসব স্মরণ করিয়া তিনি বিপুল গৌরব অনুভব করিতেন। তাঁহার রসসাহিত্য সেই গৌরবকে প্রকাশেরই চেষ্টা। যাহাকে গৌরবের মনে করিতেন তাহা সকলকে দেখাইতে চাহিয়াছেন। কাঞ্চনমালায় ভারতের গৌরবময় যুগকে দেখাইয়াছেন, বেনের মেয়েতে বাংলার গৌরবময় যুগকে দেখাইয়াছেন, আর বাল্মীকির জয়ে গৌরবময়ী পুরাণী প্রজ্ঞাকে, যাহাকে তিনি চিরন্তনী মনে করিতেন, দেখাইয়াছেন।

এ যুগের লেখকেরা দেশকে তেমন গভীরভাবে ভালোবাসেন কি? দেশ সম্বন্ধে তাঁহাদের ঔৎসুক্যে ও জ্ঞানে তেমন গভীরতা আছে কি? এমনকি দেশের সমস্যাকে তাঁহারা যেন বিদেশি চশমা দিয়াই দেখেন বলিয়া সন্দেহ হয়। তাঁহাদের রচনায় যে মর্মরশব্দটুকু শ্রুত হয় তাহা দেশের চিত্তকন্দর হইতে উত্থিত নয়, নিতান্তই সংবাদপত্র ও দলীয় বুলেটিনের আওয়াজ মাত্র। যথার্থ শিল্পধর্মচ্যুত এইসব রচনাকে

'সমাজচৈতন্য' নামের টীকা দিয়া পাঙ্‌ক্তেয় করিয়া লইবার চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু শিল্পধর্ম ও সমাজচৈতন্য তো পরস্পরবিরুদ্ধ নয়, একে অন্যের পোষক। দুইয়ে মিলিলে কি অপূর্ব সৃষ্টি হইতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত বেনের মেয়ে উপন্যাস। আধুনিকতম বিদেশি উপন্যাস যাঁহারা আগ্রহে লুফিয়া লন তাঁহারা একটু সময় করিয়া এই বইখানি পড়িলে উপকৃত হইবেন। হরপ্রসাদের মত লিখিবার শক্তি সর্বজনলভ্য নয়, কিন্তু তাঁহার মত দেশকে ভালোবাসিবার চেষ্টা করিতে ক্ষতি কি? হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রচনা সেই চেষ্টার সহায় হইবে।

তাঁহার রসসাহিত্য প্রতিষ্ঠিত এবং ভালোবাসার বন্ধনে তাহা সুবিন্যস্ত বলিয়া মনে হয়। সার্ ওয়ল্‌টার স্কট রাজনৈতিক মতবাদে টোরি ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সুগভীর স্বদেশপ্রেম তৎকালীন কোনো অনলবর্ষী বিপ্লবী বা উদারনৈতিকের চেয়ে কম ছিল না, বরঞ্চ অনেকাংশে সত্যতর ছিল বলাই উচিত, যেহেতু স্কট বর্তমান কালকে অতিক্রম করিয়া যে ঐতিহাসিক কাল রহিয়াছে তাহাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিতেন। তাঁহার উপন্যাসগুলি একাধারে এই প্রীতি ও জ্ঞানের সমন্বয়ে গঠিত। হরপ্রসাদ সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। তাঁহার রাজনৈতিক মত কি ছিল জানি না, জানিবার প্রয়োজনও অনুভব করি না, কিন্তু তৎসত্ত্বেও কেবল তাঁহার রসসাহিত্যের সাক্ষ্যের বলেই বলিতে পারি যে, দেশের প্রতি, কেবল রাজনীতিকের বা অর্থনীতিকের দেশের প্রতি নয়, ব্যাপকতর ও গভীরতর অর্থে দেশের প্রতি তাঁহার অগাধ প্রেম ছিল, দেশের ঐতিহ্যের প্রতি অসীম আস্থা ও বিশ্বাস ছিল, এবং এসব স্মরণ করিয়া তিনি বিপুল গৌরব অনুভব করিতেন। তাঁহার রসসাহিত্য সেই গৌরবকে প্রকাশেরই চেষ্টা। যাহাকে গৌরবের মনে করিতেন তাহা সকলকে দেখাইতে চাহিয়াছেন। কাঞ্চনমালায় ভারতের গৌরবময় যুগকে দেখাইয়াছেন, বেনের মেয়েতে বাংলার গৌরবময় যুগকে দেখাইয়াছেন, আর বাল্মীকির জয়ে গৌরবময়ী পুরাণী প্রজ্ঞাকে, যাহাকে তিনি চিরন্তনী মনে করিতেন, দেখাইয়াছেন।

এ যুগের লেখকেরা দেশকে তেমন গভীরভাবে ভালোবাসেন কি? দেশ সম্বন্ধে তাঁহাদের ঔৎসুক্যে ও জ্ঞানে তেমন গভীরতা আছে কি? এমনকি দেশের সমস্যাকে তাঁহারা যেন বিদেশি চশমা দিয়াই দেখেন বলিয়া সন্দেহ হয়। তাঁহাদের রচনায় যে মর্মরশব্দটুকু শ্রুত হয় তাহা দেশের চিত্তকন্দর হইতে উত্থিত নয়, নিতান্তই সংবাদপত্র ও দলীয় বুলেটিনের আওয়াজ মাত্র। যথার্থ শিল্পধর্মচ্যুত এইসব রচনাকে

'সমাজচৈতন্য' নামের টীকা দিয়া পাঙ্‌ক্তেয় করিয়া লইবার চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু শিল্পধর্ম ও সমাজচৈতন্য তো পরস্পরবিরুদ্ধ নয়, একে অন্যের পোষক। দুইয়ে মিলিলে কি অপূর্ব সৃষ্টি হইতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত বেনের মেয়ে উপন্যাস। আধুনিকতম বিদেশি উপন্যাস যাঁহারা আগ্রহে লুফিয়া লন তাঁহারা একটু সময় করিয়া এই বইখানি পড়িলে উপকৃত হইবেন। হরপ্রসাদের মত লিখিবার শক্তি সর্বজনলভ্য নয়, কিন্তু তাঁহার মত দেশকে ভালোবাসিবার চেষ্টা করিতে ক্ষতি কি? হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রচনা সেই চেষ্টার সহায় হইবে।

প্রমথ চৌধুরী

১৮৬৮ - ১৯৪৬

প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যুতে পুরাতন ও নবীন বাঙালি সাহিত্যিকদের মধ্যেকার যোগসূত্রটি ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। নিছক বয়সের কৌলীন্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও ভাবসূত্রে তিনি নবীন ও প্রবীণগণকে যুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রবীণতর আজিও যাঁহারা জীবিত আছেন তাঁহাদের সাহিত্যজীবন শেষ হইয়া গিয়াছে বলা যাইতে পারে। চৌধুরীমহাশয়ের কলম শেষ পর্যন্ত সচল ছিল। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে বয়ঃকৌলীন্যের কথা তুলিব না। যে ভাবসূত্রটি বাংলা সাহিত্যের দুই পুরুষের লেখকগণকে সংযুক্ত করিয়াছিল তাহার গ্রন্থি পড়িয়াছিল প্রমথ চৌধুরীর জীবনে।

পুরাতন ও নবীন বাঙালি লেখকদের মধ্যে প্রধান প্রভেদ এই যে, নবীনদের কলম ক্রমশ অধিক মাত্রায় বুদ্ধির বাহন হইয়া উঠিতেছে। সকলেই যে প্রখর মননশীল লেখক এমন কথা বলি না, কিন্তু হাওয়াটা বুদ্ধিবৃত্ত। বাংলা সাহিত্যের গাঙে আজ যে হাওয়া দিয়াছে সেটা বহিতেছে বুদ্ধির তীর হইতে। সেই বাতাসে ছোট বড় মাঝারি কত রকমের কত নৌকাই-না নোঙর খুলিয়া পাল তুলিয়া দিয়াছে। কতক নৌকা ধীরে চলিতেছে, কতক জোরে ; কতক চলিতেছে লক্ষ্যের বিপরীতে, আবার বানচালের সংখ্যাও অল্প নয়। পুরাতন বঙ্গসাহিত্যের হাওয়াটা ছিল ভাবাবেগের উপকূল হইতে ছুটিয়া-আসা। নবীন হাওয়াকে যদি বলি বুদ্ধিপ্রসূত, প্রবীণ কালের হাওয়াকে বলা যায় বোধপ্রসূত। অবশ্য, এই দুই কালকে আচ্ছন্ন করিয়া সর্বকালপতি রবীন্দ্রনাথ আছেন। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথকে প্রসঙ্গক্রমেও আনিয়া ফেলিলে তাঁহাকে লইয়াই আলোচনা করিতে হয়।

প্রবীণ সাহিত্যের আরও একটি সুবিধা ছিল। সেখানে যখন বুদ্ধির হাওয়া বহিত তখন ক্ষেত্রবিশেষে বহিত, অন্য ক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ সে কদাচিৎ করিত। যেমন, বলা যাইতে পারে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে, আর প্রবন্ধাবলীতে ও কৃষ্ণচরিত্রে হাওয়া এক নয়। তাঁহার উপন্যাস বোধপ্রসূত, আর শেষোক্ত গ্রন্থগুলি বুদ্ধিপ্রসূত। কিন্তু সাধারণ লক্ষণ হিসাবে নবীন সাহিত্যকে মোটের উপরে বুদ্ধিপ্রসূত বলা যাইতে পারে। আধুনিক উপন্যাস ও গল্প, প্রবন্ধ ও নাটক, এমনকি কবিতা, বিশেষত গদ্যকবিতা, সমস্তই বুদ্ধির ভূমি হইতে উদ্ভূত। বরঞ্চ যাহাদের রচনায় এই রসের কিছু কমতি, বর্তমান সাহিত্যিকসমাজে তাঁহারা অকুলীন। ইহা ভালো কি মন্দ সে আলোচনা নিরর্থক। ইহাই যুগধর্ম, এবং খুব সম্ভব, জগতের যুগধর্ম। এবং যুগধর্মের প্রভাবে এ পরিবর্তন বাংলা সাহিত্যেও অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিতেছিল, প্রমথ চৌধুরীর কলম এবং তৎসম্পাদিত সবুজ পত্রের প্রকাশ তাহাতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। সবুজ পত্র নবীন ও প্রবীণ বাংলা সাহিত্যের সংযোগসীমা, যেমন বঙ্গদর্শন ছিল আর-এক যুগসন্ধির সীমা।

যুগধর্মের সমস্ত বিক্ষিপ্ত রশ্মিকে আপন প্রতিভার দ্বারা সংহত করিয়া সবুজ পত্রের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের পুরাতন ইন্ধনে প্রমথ চৌধুরী নূতন অগ্নিসংযোগ করিয়াছিলেন। এই কার্যে রবীন্দ্রনাথকে তিনি সহায়রূপে পাইয়াছিলেন। এই নূতন যজ্ঞবেদীতলে নবীন সাহিত্যিকগণ আসিয়া সমবেত হইলেন, এই নূতন বহ্নির শিখাতেই তাঁহারা দীপ প্রজ্বলিত করিয়া লইলেন। এত বড় যুগলক্ষণাক্রান্ত ব্যাপার ঘটানো সামান্য প্রতিভার লক্ষণ নয়। ইহা যে তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল তাহার প্রধান কারণ, প্রমথ চৌধুরী ছিলেন স্বভাবত বুদ্ধিবৃত্ত লেখক। বাংলার নব্যন্যায়স্রষ্টাদের তিনি আধুনিকতম সাহিত্যিক বংশধর।

২

সবুজ পত্র সম্পাদনার আনুষঙ্গিকভাবে প্রমথ চৌধুরীর আর-একটি সাহিত্যিক কীর্তিকে বিচার করা উচিত। বাংলা সাহিত্যে মৌখিক স্টাইল নামে ভাষার একটি রীতি বিরাজমান। এই স্টাইলের প্রথম স্রষ্টা কে, সে ঐতিহাসিক বিচারের মধ্যে প্রবেশ না করিয়াও নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ই এই স্টাইলকে সাহিত্যে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা দিয়া গিয়াছেন। সবুজপত্রই এই স্টাইলের প্রথম ও অসন্দিগ্ধ বাহন। প্রধানত সবুজ পত্রের প্রভাবেই এই স্টাইল এত শীঘ্র বাংলা সাহিত্যে স্থায়িত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। সবুজ পত্র প্রকাশিত না হইলে ভাষার মৌখিক রীতি বাংলা সাহিত্যে কখনোই গ্রাহ্য হইত না, এ কথা বলা চলে না। কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য এই যে, সবুজ পত্র প্রকাশিত হইবার ফলেই উক্ত রীতির ঐ সময়ে প্রতিষ্ঠালাভ সম্ভব হইয়াছিল। যুগমাহাত্ম্যে বাঙালি লেখকগণের চিত্ত ভাষার একটি নূতন রূপ সন্ধান করিতেছিল, যে-রূপের মধ্যে যুগোচিত চটুলতা লঘুসংশয় ও বুদ্ধির দীপ্তি বিরাজমান। মৌখিক স্টাইল অনেক পরিমাণে ঐ দাবি মিটাইতে সক্ষম হইয়াছিল। অবশ্য যুগোচিত গদ্যের সমস্ত দাবি যে উক্ত মৌখিক স্টাইল মিটাইতে সমর্থ হইয়াছে এ কথা বলা চলে না। কিন্তু যতটুকু হইয়াছে প্রধানত তাহার কৃতিত্ব সবুজ পত্র সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীর প্রাপ্য। মৌখিক স্টাইলকে প্রতিষ্ঠাদান এবং সবুজ পত্র সম্পাদনা, এ দুইকে একত্র করিয়া দেখিতে হইবে ; কারণ একটি আর-একটির বাহন, যথাসময়ে বাহন না পাইলে বাহিত সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ ও মর্যাদালাভ করিত কি না সন্দেহ। এই কারণেই দুই কীর্তিকে আমরা একত্র উল্লেখ করিলাম। সবুজ পত্র বাঙালির যে মনোবৃত্তির সূচক, মৌখিক স্টাইলও বাংলা ভাষার সেই মনোভাবেরই সূচক, কাজেই দুইয়ে মিলিয়া এক।

অনেকে সাহিত্যে মৌখিক ভাষার প্রতিষ্ঠার প্রথম কৃতিত্ব আলালের ঘরে দুলালের লেখককে ও হুতোম প্যাঁচার নকশার লেখককে দিতে প্রস্তুত, প্রথম কৃতিত্ব প্রমথ চৌধুরীকে দিতে তাঁহারা রাজি নহেন। আমার মনে হয় তাঁহাদের দাবি যুক্তিসম্মত নয়। মৌখিক ভাষা ও আঞ্চলিক ভাষা এক নয়। আলাল ও হুতোম প্যাঁচার নকশা বিশেষ আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত, তাহাদের ভাষাকে মৌখিক ভাষা বলা উচিত নয়। সাহিত্যের মৌখিক ভাষা সাহিত্যের লৈখিক ভাষার মতই দেশব্যাপী পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক, আঞ্চলিক ভাষা সে দাবি করিতে পারে না। বাংলা ভাষার লেখক বাংলাদেশের যে অঞ্চলেরই অধিবাসী হোক না কেন, সে একটি সর্বজনবোধগম্য লৈখিক ভাষাতে লিখিয়া থাকে; আবার বাংলা ভাষার লেখক বাংলা-দেশের যে অঞ্চলেরই অধিবাসী হোক না কেন, একটি সর্বজনবোধগম্য মৌখিক ভাষাতে লিখিতে পারে। এদিক দিয়া বিচার করিলে সাহিত্যের লৈখিক ভাষা ও মৌখিক ভাষা দুইই সমানভাবে লেখকের হাতে গড়া, ইচ্ছা করিলে ওই অর্থে কৃত্রিম শব্দটিও ব্যবহার করা যাইতে পারে। আঞ্চলিক ভাষা সে অর্থে কৃত্রিম নহে, কিন্তু তাহা সর্বজনবোধগম্য নহে, তাহার প্রভাব বিশেষ ক্ষেত্রেই আবদ্ধ।

তবে মৌখিক ভাষার বিশেষ আঞ্চলিক ভাষার উপরে প্রতিষ্ঠিত হইতে বাধা নাই, কিন্তু দেখিতে হইবে যে তাহা যেন কলমের গুণে আপন আঞ্চলিকতাকে অতিক্রম করিয়া যায়। প্রমথ চৌধুরী যে মৌখিক ভাষাকে সাহিত্যিক পদবী দান করিয়াছেন, তাহার ভিত্তি কৃষ্ণনগরের শিক্ষিত জনসমাজের ভাষা। এ সত্য তিনি একাধিকবার স্বীকার করিয়াছেন। কৃষ্ণনগর ও তাহার ভাষা বহুকাল হইতে শিষ্ট বাংলার শিক্ষাদীক্ষার কেন্দ্র। কলিকাতার আগে কৃষ্ণনগরই ছিল বাংলার সংস্কৃতির ক্ষেত্র। সৌভাগ্যবশত প্রমথ চৌধুরী অল্প বয়সে সেখানে গিয়া

পড়িয়াছিলেন, আর সেই সঙ্গে কৃষ্ণনগরের ভাষাকে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন, তার পরে যখন সুযোগ ও তাগিদ আসিল সর্বজনীনতার উপাদান মিশ্রিত সেই ভাষা অল্পায়াসেই তাঁহার কলমের গুণে সাহিত্যিক মৌখিক ভাষায় রূপান্তরিত হইয়া গেল। বহুদিন হইতে বহুজনের যাতায়াতে যাহা বিশেষ আঞ্চলিকতার উর্ধ্বে উঠিয়াছিল তাহারই আশ্রয় পাইল বলিয়া প্রমথ চৌধুরীর মৌখিক ভাষাতেও সর্বজনবোধগম্যতাগুণ বর্তিল। ওইখানে আলাল ও হুতোমের উপরে তাঁহার ভাষার জিত।

মৌখিক ভাষাকে সাহিত্যিক পদবী দান করিয়া বীরবল সাহিত্যকে সর্বজনের পক্ষে সুগম করিয়া দিয়াছেন। আধুনিক যুগ ও আধুনিক সাহিত্য মহৎ এককের লীলার ক্ষেত্র নয়, তাহা বহুতর ক্ষুদ্রের কর্মব্যস্ততার ডালহৌসি স্কোয়ার। অর্থাৎ যুগ ও সাহিত্য দুইই গণধর্মী হইয়া পড়িয়াছে। এ সত্যটা প্রমথ চৌধুরী ভালো করিয়াই বুঝিয়াছিলেন। তিনি বলিতেছেন—

> প্রথমেই চোখে পড়ে যে, এই নবসাহিত্য রাজধর্ম ত্যাগ করে গণধর্ম অবলম্বন করছে। অতীতে অন্য দেশের ন্যায় এ দেশের সাহিত্যজগৎ যখন দু-চারজন লোকের দখলে ছিল, যখন লেখা দূরে থাক্ পড়বার অধিকারও সকলের ছিল না, তখন সাহিত্যরাজ্যে রাজা সামন্ত প্রভৃতি বিরাজ করতেন। এবং তাঁরা কাব্য দর্শন ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে, মন্দির অট্টালিকা স্তূপ স্তম্ভ গুহা প্রভৃতি আকারে বহু চিরস্থায়ী কীর্তি রেখে গেছেন। কিন্তু বর্তমান যুগে আমাদের দ্বারা কোনোরূপ প্রকাণ্ড কাণ্ড করে তোলা অসম্ভব এই জ্ঞানটুকু জন্মালে আমাদের কারও আর সাহিত্যে রাজা হবার লোভ থাকবে না এবং শব্দের কীর্তিস্তম্ভ গড়বার বৃথা চেষ্টায় আমরা দিন ও শরীর পাত করব না। এর জন্য আমাদের কোনোরূপ দুঃখ করবার আবশ্যক নেই।

বস্তুজগতের ন্যায় সাহিত্যজগতেরও প্রাচীন কীর্তিগুলি দূর থেকে দেখতে ভালো, কিন্তু নিত্যব্যবহার্য নয়। —বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ

আবার—

অর্থাৎ ভবিষ্যতে কাব্যদর্শনাদি আর গাছের মত উঁচুর দিকে ঠেলে উঠবে না, ঘাসের মত চারিদিকে চারিয়ে যাবে। এক কথায়, বহু-শক্তিশালী স্বল্পসংখ্যক লেখকের দিন চলে গিয়ে স্বল্পশক্তিশালী বহুসংখ্যক লেখকের দিন আসছে। আমাদের মনোজগতে যে নব সূর্য উদয়োন্মুখ তার সহস্র রশ্মি অবলম্বন করে অন্তত ষষ্টিসহস্র বালখিল্য লেখক এই ভূভারতে অবতীর্ণ হবেন। —তদেব

উদ্ধৃত অংশ দুটি সাঁইত্রিশ বৎসর পূর্বে লিখিত। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, তখনই প্রমথ চৌধুরী আমাদের সাহিত্যের বর্তমান অবস্থাকে যেন দিব্যচক্ষে দেখিয়াছিলেন। বাংলা সাহিত্য আজ স্বল্পশক্তিশালী বহুসংখ্যক লেখকের, কি বলিব, লীলার ক্ষেত্র বলা উচিত হইবে না, বলা উচিত নিত্যব্যবহার্য বস্তু— ওই নিত্যব্যবহার্য শব্দটাও প্রমথ চৌধুরী কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছে। তাঁহার মতে আধুনিক সাহিত্য আর কীর্তির তাজমহল বা কুতবমিনার নহে; কখনো কখনো তাহা স্কাইস্ক্রেপার রূপে দেখা দিলেও তাহা নিত্যব্যবহার্যতার অতীত নহে। এই সত্যটি প্রমথ চৌধুরী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার মৌখিক ভাষারও প্রধান গুণ নিত্যব্যবহার্যতা। তাঁহার ভাষা নব্য-সাহিত্যধর্মের সহিত সমগুণসম্পন্ন। আধুনিক সাহিত্যিকদের উপরে তাঁহার প্রভাবের রহস্য এইখানে।

৩

প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের গদ্যপদ্য প্রবন্ধনিবন্ধ এবং কবিতা, সমস্ত রচনাই প্রধানত বুদ্ধিবৃত্তিসমুদ্ভূত। অন্যান্য বাঙালি গল্পলেখকদের সঙ্গে

এইখানেই তাঁহার বিশিষ্ট প্রভেদ। এই কারণে তাঁহার গল্পগুলি অনেকটা প্রবন্ধাত্মক হইয়া উঠিয়াছে। ইহাই তাঁহার গল্পের টেকনিক। তাঁহার কলমে প্রবন্ধের গল্প হইয়া উঠিতে এবং গল্পের প্রবন্ধে পরিণত হইতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। অনেক সময়ে প্রথম দৃষ্টিতে পাঠক ঠাহর করিয়া উঠিতে পারে না, রচনাটি কি, গল্প না প্রবন্ধ। রচনার এই দ্বৈজাত্যরীতিতে আর pun বা শ্লেষের ব্যবহারে ধর্মরসিক চেস্টার্টন তাঁহার গুরু। চেস্টার্টনের গল্প ও প্রবন্ধ এক ছাঁচে ঢালা। ইঁহাদের দুজনেরই সংবেদন পাঠকের বুদ্ধিতে।

কিন্তু চৌধুরীমহাশয়ের উপরে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বোধকরি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের। বাল্যকালে বহুদিন কৃষ্ণনগরে বাস করিবার ফলে চৌধুরীমহাশয় নিজেকে কৃষ্ণনাগরিক বলিতেন। কৃষ্ণনগরের ভাষা ও ভারতচন্দ্রের কাব্য তাঁহার বুদ্ধিবৃত্ত স্বভাবকে দিগ্‌দর্শন করাইয়াছিল; কারণ, প্রাচীন বাংলা কবিদের মধ্যে ভারতচন্দ্র নিজেও বুদ্ধিবৃত্ত লেখক ছিলেন। এ কথা একরকম নিশ্চয় করিয়া বলা যায় যে, চৌধুরীমহাশয় ভারতচন্দ্রের যুগে জন্মিলে রায়গুণাকরের গোষ্ঠীর কবি হইতেন, আবার ভারতচন্দ্র বর্তমান যুগে জন্মিলে সবুজপত্রের লেখকরূপে সাহিত্যে অমরকীর্তি স্থাপন করিয়া যাইতেন।

ভারতচন্দ্রের পরেই উল্লেখ করা যাইতে পারে ফরাসি গদ্যসাহিত্যের প্রভাব। ফরাসি গদ্যসাহিত্যের প্রাঞ্জলতা, স্বচ্ছতা, বুদ্ধিদীপ্ত তীক্ষ্ণতা প্রমথ চৌধুরী অনেক পরিমাণে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছেন। লঘুচালের ভাষায়, বুদ্ধিদীপ্ত স্টাইলে এবং শ্লেষ ও যমকের ব্যবহারে তিনি যে প্রবন্ধসাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন বাংলা ভাষায় তাহা অভিনব। ঐ গুণগুলি তাঁহার প্রকৃতিদত্ত। তবে ফরাসি গদ্যের সহিত পরিচিত না হইলে তাঁহার গদ্যরচনা এমন মার্জিত হইয়া উঠিত কি না সন্দেহ। ফলত দাঁড়াইতেছে এই যে, ভারতচন্দ্রের কাব্য ও

ফরাসি গদ্যের প্রভাবে তাঁহার প্রতিভা পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়াছিল। তিনি জীবনে বিংশ শতাব্দীর লোক হইলেও ভাবজীবনে অষ্টাদশ শতকের অধিবাসী ছিলেন। ইউরোপের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতক বলিতে ভাবের একটি বিশিষ্ট রূপ বোঝায়। হৃদয়াবেগনির্মুক্ত বুদ্ধির স্বচ্ছ শুভ্র স্ফটিকের মাধ্যমে ভল্‌টেয়ার সুইফট্ পোপ প্রভৃতি অষ্টাদশ শতকের প্রধান লেখকেরা জীবনকে দেখিতে অভ্যস্ত ছিলেন। আমাদের ইতিহাসের সঙ্গে যদিচ ইউরোপের তৎকালীন ইতিহাসের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না, তথাপি কি গূঢ় কার্যকারণের ইঙ্গিতে ভারতচন্দ্রও সেই ইউরোপীয় দৃষ্টির অধিকার যেন লাভ করিয়াছিলেন।

৪

প্রমথ চৌধুরীর প্রধান কীর্তি সবুজ পত্র সম্পাদনা ; তাহার কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। সবুজ পত্র সম্পাদনা বলিতে শুধু একখানা কাগজ চালানো বোঝায় না, সমভাব ও সম-আদর্শে বিশ্বাসী একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী গঠন করিয়া সাহিত্যের ইতিহাসকে নূতন দিগ্‌দর্শন দান বোঝায়। এইজাতীয় কাজকে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের কর্মকাণ্ড বলিয়াছেন। এ কাজের জন্য বিশেষ একটি শক্তির প্রয়োজন এবং সে শক্তি খুব সুলভ নয়। আর এই কাজ যিনি সুষ্ঠুভাবে করিতে পারেন তিনি সাহিত্যের একটি মহদুপকার সাধন করেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রধান স্রষ্টা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর এই গুণটি ছিল। এই গুণ যোগে বহু লোকের সমবায় ঘটাইয়া তিনি সাহিত্য-পরিষৎ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রে এই শক্তি প্রচুর পরিমাণে ছিল— যাহার বিকাশ দেখিতে পাই সমভাবাপন্ন একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী গঠন করিয়া বঙ্গদর্শন-চালনায়। এই দুটি ঘটনাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দুটি পতাকা-স্থান। প্রাচীনতর কালে উইলিয়ম কেরিতে

এই গোষ্ঠীশক্তির বিকাশ দেখিতে পাই। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সমভাবাপন্ন পণ্ডিতগণকে সমসূত্রে স্থাপন করিয়া তিনি বাংলা গদ্যরচনার সূত্রপাত করিয়া দিয়াছিলেন। এগুলি বাংলা সাহিত্যের মহৎ ঘটনা। সবুজ পত্র সম্পাদনাও তেমনি একটি মহৎ ঘটনা, নূতন সম্ভাবনায় ও নূতন সংকেতে পূর্ণ যুগলক্ষণাক্রান্ত একটি ব্যাপার। এই ব্যাপার যাঁহার নেতৃত্বে ঘটিয়াছিল, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার আসন চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। সাহিত্যরচনার গৌরবের অপেক্ষা সাহিত্যঘটনার গৌরব লঘুতর নয়, অনেক সময়েই গুরুতর। এই গৌরবের আসনে বাংলা গদ্যের ঘটয়িতা উইলিয়ম কেরি, বঙ্গদর্শন-সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-প্রতিষ্ঠাতা রামেন্দ্রসুন্দরকে সবুজ পত্র সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী সঙ্গীরূপে পাইবেন, এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সতীর্থগণের সান্নিধ্যে অমর হইয়া বিরাজ করিতে থাকিবেন।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৭০ - ১৮৯৯

যে কয়জন প্রতিভাশালী বাঙালি সাহিত্যিক স্বল্পস্থায়ী জীবনে সাহিত্য-লীলা সমাপ্ত করিয়া অকালে মৃত্যুর রহস্যময় দিগন্তে অস্তমিত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে সতীশচন্দ্র রায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম সর্বাগ্রে মনে পড়ে। সত্যেন্দ্রনাথকে ছাড়িয়া দিলে ইঁহাদের কাহারও রচনার পরিমাণ খুব বেশি নহে। এইসব মুষ্টিমেয় রচনায় প্রতিভার নিঃসন্দিগ্ধ ছাপ আছে, কিন্তু তার চেয়ে বেশি করিয়া আছে প্রতিভার পূর্ণতর দীপ্তির আভাস। ইঁহাদের রচনা পাঠককে যেমন আনন্দ দেয়, তেমনি অসম্পূর্ণতার মধ্য দিয়া তাহার মনে আগ্রহ জাগাইয়া দেয়। যাহা হইয়াছে তাহারই পটে যাহা হইতে পারিত পাঠকের চিত্তকে আন্দোলিত করিতে থাকে। এ রকম ক্ষেত্রে ইঁহাদের রচনার সমালোচনা অনেক পরিমাণে সম্ভাবনার ইতিহাস হইতে বাধ্য।

এই সাহিত্যিক-চতুষ্টয়ের মধ্যে সতীশচন্দ্র সবচেয়ে অল্প বয়সে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স একুশ বৎসরের অধিক হয় নাই।

একুশ বৎসরের যুবককে বালক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; অধিকাংশ বাঙালি যুবক এই বয়সে কলেজের ছাত্র। অথচ সতীশচন্দ্রের গদ্য ও পদ্য প্রতিভার দীপ্তিতে ভাস্বর। ঘূর্ণমান নীহারিকার ভাস্বরতা, প্রচণ্ড বেগ ও অস্থায়িত্ব তাঁহার রচনায় বিদ্যমান। বয়ঃপরিণতির সঙ্গে-সঙ্গে এই নীহারিকামণ্ডল সংহত হইয়া স্থায়ী নক্ষত্রপুঞ্জের সৃষ্টি করিতে পারিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা ঘটিয়া ওঠে নাই। তবে এটুকু

নিশ্চিত বুঝিতে পারা যায়, সতীশচন্দ্র মূলত কবি ছিলেন। কবিদৃষ্টির উদারতা ও গভীরতা, কবির সৌন্দর্যসন্ধ নেত্র, কবিসুলভ রসপিপাসা তাঁহার রচনায় প্রত্যক্ষ। জীবনপরিণামলাভের সৌভাগ্য তাঁহার ঘটিলে তিনি বাংলাদেশের একজন মহৎ কবি হইতেন বলিয়া বিশ্বাস। আর, গদ্যরচনা যতই তিনি লিখুন-না কেন, সকলের উপরেই মহৎ কবির মুদ্রা অঙ্কিত থাকিত।

অজিতকুমার বত্রিশ বৎসর বয়সে মারা যান। এই বয়সে শক্তির দিক্‌নির্ণয় ঘটিয়া যায়, কিন্তু শক্তি তাহার পূর্ণলক্ষ্যে পৌছিতে পারে না। এই দিক্‌নির্ণয়ের সূত্র ধরিয়া বলা যায় যে, অজিতকুমারের বিশ্লেষপ্রবণ চিত্ত উত্তরোত্তর সমালোচনার পথেই চলিত। তাঁহার সব রচনাই বিশ্লেষণাত্মক সমালোচনা। তাঁহার রচিত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন-চরিত বাংলাদেশে তৎকালীন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমালোচনা ছাড়া আর কিছু নয়। এই পুস্তকখানি সমালোচনার চৌখুপি গ্রাফপেপার। ইহারই খোপে খোপে দেবেন্দ্রনাথের জীবন ও কর্মকে খণ্ড খণ্ড করিয়া তিনি বসাইয়া দিয়াছেন। খণ্ডকে সংহত করিয়া জীবনচরিত-রচনার বস্‌ওয়েলি পন্থা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নহে। অজিতকুমারের পরিণত রচনা প্রধানত হইত আলোচনা ও সমালোচনাত্মক প্রবন্ধ। তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিলে বাংলাদেশের মহৎ সমালোচক হইতে পারিতেন। রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়া দিলে মহত্তম সমালোচক হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল না।

সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুকালে বয়স হইয়াছিল চল্লিশ। এই বয়সে প্রতিভার দিক্‌নির্ণয় ও পরিণতি দুইই ঘটিয়া যায়। সত্যেন্দ্রনাথ মূলত কবি। কিন্তু তাঁহার প্রকৃত কবিজীবন একরূপ সমাপ্ত হইয়া গিয়াছিল বলিলেও চলে। তাঁহার শ্রেষ্ঠ কয়টি কবিতা ফুলের ফসল এবং কুহু ও কেকায় সঞ্চিত। এ দুইখানি কাব্য, রবীন্দ্রকাব্যের

বাহিরে যে কয়খানি উচ্চাঙ্গের বাংলা কাব্য আছে তাহাদের অন্যতম। তাঁহার চার্বাক ও মঞ্জুভাষা বাংলাসাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা। তাঁহার পরবর্তী বহু কবিতাই বিচিত্র ছন্দের পরীক্ষাক্ষেত্র বলা চলে। শতদলবাসিনী সরস্বতী ফুলের ফসল এবং কুহু ও কেকার যুগ্ম পদ্ম হইতে চরণযুগল নামাইয়া পরবর্তী সব কাব্যে তারের উপর দিয়া হাঁটিবার লীলাকৌশল দেখাইতে বাধ্য হইয়াছেন। এই ছন্দের কসরত-প্রদর্শনে কবি বিরক্ত হইয়া পড়িলে কি করিতেন? কোন্ জাতীয় রচনায় আত্মনিবেশ করিতেন? ছন্দসরস্বতীতে সমালোচনার সংহতি বা প্রত্যক্ষগতি নাই। ভাষায় প্রসাধনকলা ও ভাবের অতিব্যাপ্তি ইহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়া দিয়াছে। ডঙ্কানিশান রচনা পড়িয়া মনে হয়, সত্যেন্দ্রনাথ প্রাচীনকালের পটে উপন্যাসরচনায় কলম চালনা করিলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিতেন। তাঁহার সহায় ছিল হাস্যরসবুদ্ধি। তাঁহার প্রধান অন্তরায় অতিব্যাপ্তি উপন্যাসকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারিত না— যদিচ তাহা তাঁহার কবিতাগুলিকে, বিশেষ ব্যঙ্গকবিতাকে, শরবৎ ঋজুগতি হইতে ভ্রষ্ট করিয়া অনেক স্থলে লক্ষ্যহীন উর্ধ্বাকাশের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় অন্তরায় ছিল তাঁহার পাণ্ডিত্য। মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্য তাঁহাদের কণ্ঠে পুষ্পমাল্যের মত, তাহাতে শোভাবর্ধন করিয়াছে কিন্তু রচনাকে ভারগ্রস্ত করে নাই। সত্যেন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্য তাঁহার শেষজীবনের রচনার ঘাড়ে আড়াই-মনি তোরঙের মত চাপিয়া বসিয়াছে। ছন্দের ভাঁজে ভাঁজে বাহকের আর্তধ্বনি শ্রুত হইতে থাকে।

বলেন্দ্রনাথের অকালমৃত্যুর বয়স মাত্র উনত্রিশ। সতীশচন্দ্রকে বাদ দিলে, এই চতুষ্টয়ের মধ্যে তিনি সবচেয়ে অল্প বয়সে মারা গেলেও সাহিত্যিক সম্ভাবনাতে তিনি বোধ করি সকলের শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

২

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পৌত্র ও রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি বাল্যকালে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। সেখানে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করিবার পর হেয়ার স্কুলে চলিয়া যান এবং হেয়ার স্কুল হইতেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

অল্প বয়সেই তাঁহার সাহিত্যানুরাগ প্রকাশ পায় এবং তিনি লিখিতে আরম্ভ করেন। প্রথমে জোড়াসাঁকোর বাড়ি হইতে প্রকাশিত বালক নামে পত্রে তিনি লিখিতেন। পরে সাধনা পত্রিকার নিয়মিত লেখক হইয়া ওঠেন। পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথের চালনায় ও প্রভাবে তাঁহার সাহিত্যজীবন গড়িয়া ওঠে।

কিন্তু সাহিত্যসাধনাই বলেন্দ্রনাথের জীবনের একমাত্র বিষয় ছিল না। তাঁহার জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়দান উপলক্ষে ঋতেন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

> ইহার পরে তিনি বাণিজ্যব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। এ বিষয়েও তাঁহার প্রবল কল্পনা ছিল; একটা কিছু মস্ত ব্যাপার করিয়া তুলিব এই আশা তাঁহার মনে অহরহ জাগ্রত ছিল।·· স্বদেশিবস্ত্রের কারবারে তিনি প্রথম হস্তক্ষেপ করেন।·· রবীন্দ্রনাথও পরে যোগদান করেন।·· বলেন্দ্রনাথের যত্নেই প্রথম স্বদেশি ভাণ্ডার আদির একরূপ সূত্রপাত হয় বলা যায়।·· তিনি জীবনের শেষভাগে আর্যসমাজ লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়েন। কিসে আর্যসমাজের সহিত ব্রাহ্মসমাজের মিলন ও একতা সাধিত হয় তাহার জন্য তাঁহার মনের একাগ্রতা।·· তিনি নিজে লাহোরে গিয়া পাঞ্জাবি আর্যসমাজীদিগের মধ্যে থাকিয়া এই কার্য করিতে প্রবৃত্ত হয়েন।

বলেন্দ্রনাথের বিবাহ হয় ১৩০২ (১৮৯৬) সালের ২২এ মাঘ। বলেন্দ্রনাথ নিঃসন্তান ছিলেন।

ইহাই সংক্ষেপে বলেন্দ্রনাথের বাস্তব জীবন। তাঁহার মানসজীবনের পরিচয় বহন করিতেছে তাঁহার রচনাগুলি।

বলেন্দ্রনাথের রচনার পরিমাণ বড় অল্প নহে। গদ্য ও পদ্য দুই শ্রেণীর রচনাই তিনি লিখিয়াছেন। গদ্যের ভাগই বেশি। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলীর ডিমাই আকারের পুস্তকের গদ্যাংশ ৬৯২ পৃষ্ঠা। মাধবিকা (১৮৯৬) ও শ্রাবণী (১৮৯৭) নামে দুখানি কাব্যগ্রন্থও তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন, অধিকাংশই প্রেমের কবিতা। বর্তমান প্রবন্ধে গদ্যরচনাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

বলেন্দ্রনাথের গদ্যরচনার বহুলতার চেয়েও অধিকতর উল্লেখযোগ্য তাহার বিষয়বৈচিত্র্য। স্বল্পস্থায়ী সাহিত্যজীবনে নানা শ্রেণীর রচনা তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। সমালোচনাজাতীয় রচনাই বেশি, সমালোচনারও আবার কত রকম উপশ্রেণী। সাহিত্যসমালোচনার অন্তর্গত সংস্কৃত ও বাংলা কাব্যের আলোচনা আছে। চিত্রসমালোচনা আছে। সামাজিক প্রবন্ধ, ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। দেশীয় আচারব্যবহার-বিষয়ক প্রবন্ধও রহিয়াছে। দেবস্থান পীঠস্থান প্রভৃতিও তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। ইহা ছাড়া আর এক শ্রেণীর প্রবন্ধ আছে, যাহাকে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বা 'পার্সন্যাল এসে' নাম দেওয়া যাইতে পারে। ইহাদের সংখ্যা অল্প নয়। আর আছে কতকগুলি নিছক প্রকৃতিবর্ণনা। ন্যারেশন বা কথাভাসপূর্ণ রচনারও অভাব নাই। গ্রন্থাবলীখানিতে ভালো-মন্দ পরিণত-অপরিণত সব জাতের রচনা একত্র ঠাসিয়া ভর্তি করিয়া রাখা হইয়াছে। অনিয়ন্ত্রিত ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে বাংলা সাহিত্যের অনেক শ্রেষ্ঠ রচনা সমাহিত হইয়া পড়িয়া আছে, বাঙালি পাঠকের পক্ষে না তাহা গৌরবজনক, না তাহা লাভজনক। অবিলম্বে বলেন্দ্রনাথের রচনার একখানি সংকলনগ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া উচিত।

৩

বলেন্দ্রনাথের স্বকীয় প্রতিভার বিশিষ্ট স্বরূপটি কি? যেসমস্ত রচনা তিনি রাখিয়া গিয়াছেন তাহার অধিকাংশই সমালোচনাজাতীয়। অজিতকুমারের অধিকাংশ রচনাও সমালোচনাশ্রেণীর। কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে। অজিতকুমারের সমালোচক-দৃষ্টি অখণ্ডকে ভাঙিয়া সত্যকে দেখিতে চাহিয়াছে, বলেন্দ্রনাথের সমালোচক-দৃষ্টি খণ্ডকে জুড়িয়া সৌন্দর্য দেখিতে চাহিয়াছে। একজনের দৃষ্টি সত্যসন্ধ, অপরের সৌন্দর্যসন্ধ। অজিতকুমারের কাছে সমালোচনা বিজ্ঞান, বলেন্দ্রনাথের কাছে সমালোচনা কলা; অজিতকুমার সমালোচনায় বৈজ্ঞানিক, বলেন্দ্রনাথ সমালোচনায় শিল্পী; একজনের কাছে সমালোচনা তত্ত্ব ছাড়া আর কিছু নয়, অপরের কাছে তাহা সৃষ্টিকার্য। বলেন্দ্রনাথের মন মূলত কবির মন। কবির মনের কাছে জগৎ এবং সাহিত্য শিল্প ও চিত্রাদি অর্থাৎ প্রকৃতির সৃষ্টি ও মানুষের সৃষ্টি একই রূপ, একই সৌন্দর্যময় সত্তা উদ্ঘাটিত করিয়াছে। তিনি সৌন্দর্য ভোগ করিয়াছেন, এবং অপরের চোখে আঙুল দিয়া, কখনো বা তাহার উত্তরীয়প্রান্ত টানিয়া তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া তাহাকে সেই সৌন্দর্য দেখাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার কবিমন অখণ্ডকে খণ্ডিত করিতে, সৌন্দর্য নিঙড়াইয়া তত্ত্ব বাহির করিতে, অত্যন্ত পীড়া বোধ করে। সৌন্দর্য জগৎব্যাপারের পরিণাম ও পরা নিয়ম, ইহাই যেন তাঁহার ধারণা। সৌন্দর্যে বিশ্বরূপ-দর্শনই মানবজীবনের মহৎ কর্তব্য, ইহাই যেন তিনি বলিতে চাহেন। সৌন্দর্যদর্শনের ও সৌন্দর্যভোগের এমন কীট্‌সীয় দৃষ্টি ও মন লইয়া আর কোনো বাঙালি লেখক জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইহাই বলেন্দ্রনাথের প্রতিভার একাধারে বৈশিষ্ট্য এবং সীমা।

এই বিশিষ্ট গুণকে দুইটি সাহিত্যিক প্রভাব বলবত্তর করিয়াছিল:

সংস্কৃত সাহিত্য এবং রবীন্দ্রসাহিত্য। বলেন্দ্রনাথের রচনায় সংস্কৃতজ্ঞানের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা প্রধানত কালিদাস ও কাদম্বরী হইতে প্রাপ্ত। কালিদাসের সৌন্দর্যানুরাগ এবং বাণভট্টের সুন্দর চিত্রাঙ্কনস্পৃহা বলেন্দ্রনাথের সৌন্দর্যরসপ্রবণ প্রতিভাকে শক্তিশালী করিয়াছে।

রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রভাবও তাঁহার উপরে অনুরূপ প্রতিক্রিয়া করিয়াছে। বলেন্দ্রনাথের প্রতিভাবিকাশের সময় আর মৃত্যুর সময় ভিন্ন নয়, এই সময়টা রবীন্দ্রনাথের কল্পনা কাব্য ও প্রাচীন সাহিত্যর অনেক প্রবন্ধ প্রকাশের কাল। কল্পনা নির্যাসিত সৌন্দর্যের কাব্য, প্রাচীন সাহিত্যে কালিদাস-বিষয়ক প্রবন্ধগুলি সমালোচনার সৃষ্টিকার্য। আর আগেই বলিয়াছি যে, সৌন্দর্যদর্শন ও সমালোচনার সৃষ্টিকার্য বলেন্দ্রনাথের বিশিষ্ট গুণ। এ দুইও আবার ভিন্ন নয়; মানুষের সৃষ্টি ও প্রকৃতির সৃষ্টির মধ্যে অখণ্ডরূপের সন্ধান, যাহার অপর নাম সৌন্দর্যসন্ধান, ইহাই বলেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা। রবীন্দ্র-সাহিত্যের এই বিশিষ্ট পর্বটা পরিণত বলেন্দ্রনাথের উপরে প্রভাব বিস্তার করিয়া তাঁহাকে বলশালী হইতে সাহায্য করিয়াছে।

স্বকীয় বিশিষ্ট গুণের অনুরূপ গুণের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া মানব-জীবনের একটা বিশেষ সৌভাগ্য। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় প্রভাব-বৈষম্যের ফলে মানুষের জীবন খণ্ডিত ও বিকৃত হইয়া পড়ে। মিল্‌টনের স্বাভাবিক সৌন্দর্যরসপ্রবণ চিত্ত পিউরিটান ফিলজফির মরুভূমি অতিক্রম করিতে গিয়া কি দুঃসহ দুঃখভোগই-না করিয়াছে। খণ্ডিত প্রতিভা মহৎ সার্থকতা লাভের প্রধান অন্তরায়। বলেন্দ্রনাথের প্রতিভা যে শ্রেণীরই হোক, এই দুর্ভাগ্য হইতে অন্তত তিনি রক্ষা পাইয়াছিলেন।

তাঁহার সৌন্দর্যদর্শনরূপ মূলশক্তি সংস্কৃত কাব্যের ও রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ সৌন্দর্যবাদ দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে অল্পবয়সে তাঁহার শক্তি অনেক পরিমাণে পরিণতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এবং পদে

পদে তাঁহাকে নিজের সহিত লড়াই করিতে হয় নাই বলিয়া তাঁহার রচনার পরিমাণও সমধিক হইতে পারিয়াছিল।

আবার এই স্বভাবজ সৌন্দর্যপিপাসা ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবের সঙ্গেই তাঁহার স্টাইলের ও ভাষার সমস্যা জড়িত। যথার্থ সৌন্দর্যরস-প্রবণতা মানুষকে সংযম শালীনতা ও আধ্যাত্মিক আভিজাত্য দান করে। এইগুলি তাঁহার ভাষা ও স্টাইলের গুণ। আবার কাদম্বরী ও কালিদাসের প্রভাবও একই সঙ্গে তাঁহার রচনায় বিদ্যমান। বর্ণাঢ্য শব্দাঢ্য ভাষা, উপমা- ও অলংকার- বহুল স্টাইল তাঁহার বৈশিষ্ট্য, এগুলির জন্য তিনি প্রধানত সংস্কৃত সাহিত্যের নিকট ঋণী। বলেন্দ্রনাথের রচনা পাঠ করিলে একটি আধ্যাত্মিক আভিজাত্যের পরিচয় পাঠকের মনে ছাপ রাখিয়া যায়। এই আধ্যাত্মিক আভিজাত্য লেখকের অন্তর্নিহিত বিশিষ্ট প্রতিভার প্রকাশ্য বাহ্যরূপ ছাড়া আর কিছু নয়।

পূর্বেই বলিয়াছি, বলেন্দ্রনাথের রচনার আলোচনা কতক পরিমাণে সম্ভাবনার আলোচনা হইতে বাধ্য। জীবনের স্বাভাবিক দীর্ঘতা পাইলে তাঁহার রচনার কি পরিণাম ঘটিত? তাঁহার পরিণত রচনা যাহা বর্তমান তাহার অধিকাংশই নিছক সৌন্দর্যভোগস্পৃহা হইতে সঞ্জাত। তাঁহার কাব্যবিচারও সমালোচনার বেনামিতে সৌন্দর্যসৃষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁহার উড়িষ্যার দেবতা-দেউলের আলোচনাও ভাষার মধ্যে পাথরের সৌন্দর্যকে ফুটাইবার চেষ্টা ছাড়া আর কি।

কিন্তু, এই কীট্‌সীয় সৌন্দর্যভোগস্পৃহাতে আর যেন তিনি স্বস্তি পাইতেছিলেন না, তাঁহার সৌন্দর্যভোগের মনোবৃত্তিতে কোথায় যেন একটা ফাটল ধরিয়া উঠিতেছিল; এবং এই ফাটলের অবকাশে জীবনের বৃহত্তর কর্মজীবনের মধ্যে বাহির হইয়া পড়িবার একটা অব্যক্ত আকুতি যেন তাঁহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। ইহার প্রমাণ কি? তাঁহার জীবনীকার বলিয়াছেন যে, তিনি এক সময়ে বাণিজ্যব্যাপারে ও

স্বদেশিভাণ্ডার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। আর, জীবনের শেষভাগে তিনি আর্যসমাজ লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়েন। আর্যসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে কার্যপ্রণালীর সমন্বয় সাধন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি পঞ্জাবে যান। এইসব প্রচেষ্টার মূলে কোন্ মনোভাব সক্রিয় ছিল? বলেন্দ্রনাথ কর্মী ছিলেন না, কর্ম তাঁহার প্রতিভার ও চরিত্রের স্বাভাবিক বাহন ছিল না। তবে এই কর্মোদ্যোগ কেন? আত্মজীবনকেন্দ্রী মোহময় সৌন্দর্যলোক তাঁহাকে পীড়িত করিয়া তুলিতেছিল, এই মোহজগৎ হইতে কর্মজগতে বাহির হইয়া পড়িবার চেষ্টাই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে তাঁহার এইসব কর্মোদ্যোগে। কিন্তু ইহাও নিশ্চিত করিয়া বলা যাইতে পারে যে, তিনি জীবিত থাকিলে একদিন এই বাহ্যকর্মানুষ্ঠানও তাঁহাকে বিরক্ত করিয়া তুলিত। তিনি কর্মের বাহ্যজগৎ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া নবীনতর উৎসাহে আবার সাহিত্যলোকে ফিরিয়া আসিতেন। কিন্তু সে সাহিত্য কোন্ শ্রেণীর? নিশ্চয় তাহা আর পূর্বতন নিছক সৌন্দর্যসৃষ্টির সাহিত্যলোক নয়। খুব সম্ভবত তিনি কাহিনীরচনার দিকে মনঃসংযোগ করিতেন, যাহার অল্পবিস্তর সূত্রপাত আছে চন্দ্রপুরের হাট এবং পুলের ধারে প্রভৃতি রচনায়। গল্প উপন্যাস ও কাহিনী যতই সৌন্দর্যময় হোক-না কেন, তাহাদের আত্মকেন্দ্রী সৌন্দর্য বলা চলে না। যেহেতু একবার গল্পের সূত্র ধরিয়া অবতীর্ণ হইলেই লেখক নিজের জীবন হইতে বাহির হইয়া সংসারের বৃহত্তর জীবনের মধ্যে নামিয়া আসিতে বাধ্য হয়। গল্পের নায়কনায়িকা ও ঘটনাপ্রবাহ লেখককে তাঁহার অভীষ্ট পথ হইতে টানিয়া লইয়া চলে। তাহাদের জীবনের দাবির নিকটে লেখকের ব্যক্তিগত দাবি ও অভিরুচিকে খর্ব করিতে হয়। আত্মতন্ত্র সেখানে পরতন্ত্রের নিকটে নতমস্তক। গল্প-উপন্যাসের কর্মজগৎ পরোক্ষে বৃহত্তর জীবনের কর্মজগৎ ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের বিশ্বাস, বলেন্দ্রনাথ জীবনপরিণাম ভোগ করিবার

সৌভাগ্য লাভ করিলে কাহিনীরচনার কর্মজগতে প্রবেশ করিয়া স্বস্তি ও চরিতার্থতা লাভ করিতেন, এবং তাঁহার হস্তক্ষেপে বাংলার উপন্যাস-সাহিত্য নূতন সার্থকতা লাভ করিত।

৪

কিন্তু কি হইতে পারিত, নূতন কোন্ ঐশ্বর্য লাভ করিত তাঁহার রচনা, ইহাতেই সমালোচনা পর্যবসিত হইলে তাঁহার প্রতি সুবিচার করা হইবে না। যেসব রচনা তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে যে ঐশ্বর্য ও প্রতিভার চিহ্ন আছে তাহাতেই তিনি বাংলা সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করিবেন।

বলেন্দ্রনাথের প্রধান ঐশ্বর্য তাঁহার দৈবী ভাষা ও দিব্য কল্পনা। ভাষার এমন মহিমা রবীন্দ্রসাহিত্যের বাহিরে বড়-একটা চোখে পড়ে না। শব্দাঢ্য বর্ণাঢ্য অলংকৃত উপমাবহুল ভাষার কি চতুরঙ্গ ঐশ্বর্য। অধিকাংশ লেখকের কাছেই ভাষা ভাবপ্রকাশের একটা উপায় মাত্র। ভাবের তল্পি বহিয়া পীড়িত ও নিঃস্ব ভাষা তাহাদের ভাবের অনুগামী মাত্র; তাহাদের ভাষার যেন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। বলেন্দ্রনাথের ভাষা আদৌ সে শ্রেণীর নয়। তাঁহার ভাষা রাজকন্যার বহুরত্নাদিবিভূষিত নানাচিত্রাদিসুশোভিত কারুকার্যের মহিমায় উজ্জ্বল শিবিকার মত; আর সেই শিবিকার বাহকদেরই বা কি সাবলীল গতি; সৌকর্য্যও মন্দ নহে। রাজকুমারী হয়তো অনবদ্যরূপা, কিন্তু তাহার শিবিকাখানিও তুচ্ছ নয়। শিবিকার তিরস্করণীর অন্তরালবর্তিনীর মূর্তি চোখে না পড়িলেও নিতান্ত দুঃখ করিবার কিছু নাই, শিবিকার সৌন্দর্যেই চক্ষু ধন্য হইয়া যায়—

> কণারকে এখন কিছুই নাই, ধূ ধূ প্রান্তর মধ্যে শুধু একটি অতীতের সমাধিমন্দির— শৈবালাচ্ছন্ন জীর্ণ দেবালয় এবং তাহারই বিজন কক্ষের

মধ্যে পুরাতন দিনের একটি বিপুল কাহিনী। সেই পুরাতন দিন, যখন এই মন্দিরদ্বারে দাঁড়াইয়া লক্ষ লক্ষ শুভ্রকান্তি ব্রাহ্মণ যাজক যজ্ঞোপবীতজড়িত হস্তে সাগরগর্ভ হইতে প্রথম সূর্যোদয় অবলোকন করিতেন ; নীল জল শুভ্র আনন্দে তাঁহাদের পদতলে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত এবং নীল আকাশ অবারিত প্রীতিভরে অরুণিম আশীর্বাদধারা বর্ষণ করিত।· ·

এই বিলাসখচিত মন্দিরের দ্বারে কত লোকে কত দিন অন্তরের দারুণ নির্বেদ লইয়া আসিয়াছে। সংসার পাছে কামনার উদ্রেক করে, পাছে কোনোদিন স্ত্রীর মুখ দেখিয়া মোহ উপস্থিত হয়, সন্তানের মায়া কাটানো না যায়, বৃদ্ধ পিতামাতার অশ্রুজল বন্ধনছেদনে বাধা দেয়, গৃহ স্ত্রী পিতা মাতা সমস্ত পরিজন পরিত্যাগ করিয়া লোকে দেবদ্বারে আসিয়া হত্যা দিয়া পড়িয়াছে, হে দেবতা রক্ষা কর, মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া দাও, আমি তোমার দ্বারে চিরদিন সন্ন্যাসী হইয়া রহিব। হায়, জড় দেবতা, সে যদি বুঝিত তুমি কি অন্ধকার মোহরাশিতে গঠিত ! ক্ষীণ দীপালোকে তুমি ভক্তহৃদয়ের বৈরাগ্য অনুমোদন কর ; এবং শত দীপালোকে তোমারই সম্মুখ-প্রাঙ্গণে নিত্য মদনবিলাসের এক-এক অঙ্ক অভিনীত হয় !

পরিত্যক্ত পাষাণস্তূপের নির্জন নিকেতনে নিশাচর বাদুড় বাসা বাঁধিয়াছে, হিমশিলাখণ্ডোপরি বিষধর ফণিনী কুণ্ডলী পাকাইয়া নিঃশঙ্ক বিশ্রামসুখে লীন হইয়া আছে ; সম্মুখের ঝিল্লিমুখরিত প্রান্তরদেশ দিয়া গ্রাম্য পথিকজন যখন কদাচিৎ দূর তীর্থ উদ্দেশে যাত্রা করে, একবার এই জীর্ণ দেবালয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চতুর্দিকে চাহিয়া দেখে এবং বিলম্ব না করিয়া আসন্ন সূর্যাস্তের পূর্বেই দ্রুতপদে আবার পথ চলিতে থাকে।— কণারক এখন শুধু স্বপ্নের মত, মায়ার মত ; যেন কোন্ প্রাচীন উপকথার বিস্মৃতপ্রায় উপসংহার শৈবালশয্যায় এখানে নিঃশব্দে

অবসিত হইতেছে এবং অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মিরেখায় ক্ষীণপাণ্ডু মৃত্যুর মুখে রক্তিম আভা পড়িয়া সমস্তটা একটা চিতাদৃশ্যের মত বোধ হয়। —কণারক

বাস্তবিক বলেন্দ্রনাথের ভাষা কণারকের পরিত্যক্ত মন্দিরের মতই। কণারকের মন্দিরের মতই তাহাতে বলিষ্ঠ বিশালতার সঙ্গে কমনীয় সৌন্দর্যের কি অপরূপ সমন্বয়; আবার কণারকের মন্দিরের মতই তাহা নিঃসঙ্গ এবং পরিত্যক্ত; আর কণারকের মন্দিরের বাহ্য মদনোৎসবের অভ্যন্তরে যেমন সুকঠিন বৈরাগ্যের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত, বলেন্দ্রনাথের শিল্পও তেমনি একাধারে অনুরাগ ও বিরাগের লীলাস্থল, শিল্পের ইন্দ্রিয়বিলাসের তলে শিল্পীর কঠোর বৈরাগ্য অভিমূর্ত। রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্যের বাহিরে আর এমন ভাষা অধিক আছে কি? সত্যই এ ভাষা কণারকের মন্দিরের মত নিঃসঙ্গ এবং পরিত্যক্ত। ভাষার এমন ছন্দঃস্পন্দ, এমন স্বপ্রতিষ্ঠিত মহিমা বাংলা সাহিত্য হইতে যেন লোপ পাইয়াছে। মেঘদূতের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, কালিদাসের আমলের তুলনায় বর্তমান যেন অনেক পরিমাণে ইতর হইয়া পড়িয়াছে। বাংলা ভাষা যে ইতর হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এখন ভাষার প্রতি লেখকদের আর 'প্রেমিকের দৃষ্টি' নাই, নিতান্তই ভৃত্যের দৃষ্টিতে তাঁহারা ভাষাকে দেখিয়া থাকেন। এখন বাংলা ভাষার গতি বাড়িয়াছে, শব্দসম্পদ বাড়িয়াছে, নমনীয়তাও কিছু বাড়িয়াছে। কিন্তু বলেন্দ্রনাথের ভাষায় যে আভিজাত্য, যে মহিমময় পদক্ষেপ, যে উদার আড়ম্বর দৃষ্ট হয়, তাহা কি লোপ পায় নাই? ভাষার সে রাজকীয়তা আর নাই, ভাষা এখন নির্বাচনোত্তীর্ণ এম. এল. এ.র স্তরে, বিচক্ষণ কারিগরের স্তরে নামিয়া আসিয়াছে। ভাষা এখন ভাবপ্রকাশের যন্ত্রমাত্র, ভাষা আর স্বপ্রতিষ্ঠ নহে। হয়তো কালের গতিতে ইহাই অনিবার্য। রাজকীয় কালের সঙ্গে রাজকীয় ভাষাও

গিয়াছে। বহুজনের আত্মপ্রকাশের পথ করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে ভাষাকে এখন বিস্তৃত হইতে হইয়াছে; তাহাতে পুরাতন ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরের কিছু সংকোচ অপরিহার্য। বলেন্দ্রনাথের ভাষার 'রাজবত্নুন্নতধ্বনি' ছন্দঃস্পন্দকে বর্তমানের রাজতন্ত্রবিরোধী জনগণ স্বভাবতই কিছু সংশয়ের চক্ষে দেখিয়া থাকে।

বলেন্দ্রনাথের ভাষার সেই ধ্বনি আর ফিরিবে না, কিন্তু লোপও পাইবে না। কণারকের মন্দিরের অনুরূপ আর গঠিত হইবে না সত্য, কিন্তু সে ভগ্নাবশেষ যে অবলুপ্ত হইবে এমন সন্দেহ করিবারও কারণ নাই। বিস্তীর্ণ বালুশয্যা অতিক্রম করিয়া লোকে কণারকের শোভাসৌন্দর্য দেখিতে যাইবে; বলেন্দ্রনাথের ভাষার ঐশ্বর্যভোগ করিবারও লোকের অভাব হইবে না। তাই বলিতেছিলাম, তাঁহার ভাষা কণারকের মন্দিরের মতই নিঃসঙ্গমহিম এবং প্রাচীন আড়ম্বরের লীলাস্থল। বলেন্দ্রনাথ দীর্ঘজীবন লাভ করিলে নূতন কি সম্পদের সৃষ্টি করিতে পারিতেন তাহা ব্যর্থ জল্পনার অন্তর্গত, কিন্তু ভাষার মহিমার জন্যই যে তিনি বাংলা সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবেন, ইহা সুনিশ্চিত। তাঁহার বহুতর রচনার বালুশয্যা পার হইয়া ভাষার কণারক দেখিতে খুব বেশি লোকের যাইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু কষ্টসংকল্পী যে রসিকেরা একবার সেদিকে দৃষ্টিপাত করিবেন তাঁহাদের সকল অধ্যবসায় যে সার্থক হইয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৭১ -

বহুমুখীপ্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির দুর্ভাগ্য এই যে, অনেক সময়েই এক দিকের খ্যাতির তলে তাঁহার অন্য দিকের কৃতিত্ব চাপা পড়িয়া যায়; সব দিকের কৃতিত্ব কদাচিৎ সমানভাবে স্বীকৃত হয়। তার কারণ, প্রতিভার বহুমুখিতার প্রতি সাধারণ মানুষের কেমন যেন একটা অবিশ্বাসের ভাব আছে। তাই সে একটা মাত্র কৃতিত্বকে আদরে বাছিয়া লইয়া অন্যগুলিকে অবহেলা করে। পাঠকের রসাস্বাদে বহুমুখিতার অভাব প্রতিভার বহুমুখিতার অস্বীকৃতির অন্যতম কারণ।

রবীন্দ্রনাথের মত বহুমুখী প্রতিভা বিরল। অলোকসাধারণ সাহিত্যিক-বিরাটপুরুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে তাঁহার যে অপ্রত্যাশিত বিলম্ব ঘটিয়াছিল তার একটি প্রধান কারণ তাঁহার প্রতিভার বহুমুখিতা। এখন তিনি সর্বজনস্বীকৃত কবিগুরু, কিন্তু বহুমুখিতার স্বাভাবিক অভিশাপ হইতে সম্পূর্ণভাবে যে তিনি মুক্ত হইতে পারিয়াছেন তাহা মনে হয় না। লোকসমাজে কবিরূপেই তিনি অবিসংবাদী। এই কবিখ্যাতির ফলেই তাঁহার অন্যান্য খ্যাতি কিয়ৎপরিমাণে দ্বিধাগ্রস্ত। তিনি পঞ্চাশখানার বেশি নাটক লিখিয়াছেন, তাঁহার উপন্যাস ও গল্প -গ্রন্থের সংখ্যা বিংশোত্তীর্ণ, প্রবন্ধাদির সংখ্যাও কম নয়। কিন্তু কবি-কৃতিত্বের উচ্চতম শৃঙ্গটির আড়ালে এইসব উচ্চশৃঙ্গ কতক পরিমাণে প্রচ্ছন্ন। যে সৌভাগ্যবান পাঠক দুরূহ অধ্যবসায়ে তাঁহার কাব্যশিখরে আরোহণ করিয়াছেন, কেবল তিনিই অন্যান্য শৃঙ্গের উচ্চতা দেখিয়া বিস্মিত হইবেন; ভূতলচারীদের কাছে প্রধানত তিনি কবিই থাকিয়া যাইবেন। দুঃসাহসী পাঠক দেখিবেন, তাঁহার অপরাপর মহিমা কবি-

মহিমার চেয়ে কম নয়। সমগ্রকে অখণ্ডদৃষ্টিতে দর্শনই সমালোচনার মর্মরহস্য। সমালোচক বিরল।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই যদি বহুমুখিতার এই অভিশাপমুক্ত না হন, তবে অন্যের আর আশা কোথায়। অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভাও কতক পরিমাণে এই অভিশাপের দ্বারা খণ্ডিত। তাঁহার প্রতিভাও বহুমুখী; বহুমুখী এবং ভিন্নমুখী, যার ফলে তাঁহার মহিমা সর্বতোভাবে, যথার্থ-ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অবনীন্দ্রনাথের প্রধান কৃতিত্ব তাঁহার চিত্রশিল্প, এবং ইহাই তাঁহার প্রথম কৃতিত্ব। আর এই প্রথম কৃতিত্বের আড়ালে তাঁহার সাহিত্যিক পরিচয় কেবল গৌণভাবেই প্রকাশিত। অবনীন্দ্রনাথ শিল্পী এবং শিল্পীগুরু। শিল্পের কৃতিত্বে এবং শিল্পের ইতিহাসে কোথায় তাঁহার আসন, সে আলোচনা যথেষ্ট হইয়াছে; কিন্তু সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথের আসন-নির্দেশের চেষ্টা এ পর্যন্ত হয় নাই। ইহা দুঃখের হইলেও বিস্ময়ের নহে; কারণ পূর্বেই বলিয়াছি, বহুমুখিতার স্বীকৃতিতে সাধারণের একটা কেমন যেন অনুত্তম আছে। অথচ বিচারে নামিলে দেখা যাইবে, সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথের আসন শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের নীচে নয়, আর বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের অন্তর্বর্তী যুগের লেখকদের অধিকাংশের উপরে।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়া দিলে যে কয়জন লেখক গদ্য-রচনার দ্বারা খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন, গদ্যরচনাভঙ্গির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য যাঁহাদের আছে, বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সত্ত্বেও নিজেদের মনের ছাপ গদ্যভঙ্গির উপরে যাঁহারা আঁকিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা অল্প নয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিজস্ব একটি গদ্যরীতি আছে, কিন্তু তার উপরে বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ কাহারও প্রভাব নাই। কিন্তু এ বিষয়ে তিনিই বোধ হয় একক। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অক্ষয় সরকার—দুজনেরই নিজস্ব গদ্যরীতি আছে; কিন্তু তাঁহাদের রচনার কাঠামো

বঙ্কিমচন্দ্রের শেষজীবনের গদ্য। শ্রীযোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধির গদ্যরীতি বিচিত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের ভাষা না পাইলে ইঁহাদের গদ্যরীতি সম্ভব হইত কি না সন্দেহ। বীরবলী গদ্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনে শিল্পদক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছে। পূর্ণ রবীন্দ্রপ্রভাবের সময়েও শরৎচন্দ্র গদ্যরচনায় যে স্বকীয়তা দেখাইয়াছেন তাহাতে তাঁহার মনীষা প্রকাশ পায়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গদ্যভঙ্গির উপরেই তাঁহার স্টাইল প্রতিষ্ঠিত। ইঁহাদের সকলের মতই এবং সকলের চেয়ে বেশি করিয়া অবনীন্দ্রনাথের গদ্য নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ। অবনীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির পরিণত প্রকাশ রাজকাহিনী (১৯০৯), নালক (১৯১৬) প্রভৃতি গ্রন্থে এবং তাহার চরম ঘরোয়া (১৯৪১) এবং জোড়াসাঁকোর ধারেতে (১৯৪৪)। এই স্টাইলেও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আছে, কিন্তু লেখকের স্বকীয়তা অতিশয় স্পষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ একাধিক স্টাইল ব্যবহার করিয়াছেন। অন্যান্য যাঁহাদের নাম করিলাম, তাঁহাদের স্টাইল একাধিক নয়। অবনীন্দ্রনাথও একটিমাত্র স্টাইল ব্যবহার করিয়াছেন। বাংলার ব্রত (১৯১৯) ও বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলীতে (১৯২১-২৯। প্র. ১৯৪১) যে প্রভেদ তাহা কেবল বিষয়বস্তুর পার্থক্যেই ঘটিয়াছে; সে প্রভেদ কেবল শাখাপ্রশাখায়, মূল কাণ্ডটা একই।

২

সাহিত্যের ছন্দ তিন ভাগে বিভক্ত। ইহাদের নাম দেওয়া যাইতে পারে গীতিস্পন্দ বাক্যস্পন্দ এবং লেখনীস্পন্দ। কাব্যে এই তিন স্পন্দই অত্যন্ত স্পষ্ট, এবং উদাহরণও প্রচুর মিলিবে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য হইতেই সমস্ত দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইতে পারে।

ক্ষণিকার অধিকাংশ কবিতা বাক্যস্পন্দের অন্তর্গত; মুখের বাক্য-ভঙ্গিকে সামান্য আয়াসে বাঁকাইয়া তাহার সঙ্গে ছন্দের জ্যা যুক্ত করিয়া

এই কাব্য গঠিত। গদ্যকবিতাও এই শ্রেণীর অন্তর্গত ; কিন্তু তাহাকে পদ্যের কোঠায় না ফেলিয়া গদ্যের কোঠায় ফেলিয়া বিচার করাই উচিত।

লেখনীস্পন্দের উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও ছন্দ কবিতা। ইহা বাক্যভঙ্গিও নয়, গীতিভঙ্গিও নয় ; কলমের ডগা ছাড়া এ বস্তু লিখিত হইতে পারে না। মানুষ কথা বলে, মানুষ গান করে, আবার মানুষ লেখে। প্রাচীন কালে মানুষ কেবল কথাই বলিত এবং গান করিত ; তখন লিখিত না। কিন্তু বহুকালের অভ্যাসে মানুষ মসীজীবী বা লেখক হইয়া পড়িয়াছে। এই লিখনশীলতা মানুষের স্বাভাবিক নয়, অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত। লিখনশীলতা মানুষের প্রকাশের সীমাকে অনেক পরিমাণে বাড়াইয়া দিয়াছে। অনেক কথা যাহা না বাচ্য, না গেয়, তাহা লেখ্য। লেখনীর ঘটকালি না ঘটিলে তাহা কখনো প্রকাশ পাইত কি না সন্দেহ। ভাষা ও ছন্দ কবিতা তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

গীতিস্পন্দের উদাহরণ অবিরল। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গানেই গীতিস্পন্দ আছে ; সুরযুক্ত বলিয়াই যে আছে তাহা নয়, গীতিস্পন্দ আছে বলিয়াই সুরযুক্ত হইয়াছে। অধিকাংশ বৈষ্ণবপদ গীতিস্পন্দপ্রধান। সুরে গীত না হইলেও এগুলি গীতিকবিতা, ইউরোপীয় অলংকারশাস্ত্রমতে লিরিক।

এ যেমন পদ্যে, তেমনি গদ্যেও এই তিন স্পন্দের লীলা দেখা যায়। সীতার বনবাসের স্পন্দ লেখনীস্পন্দ ; ও জিনিস গীত হইবার নয়, উক্ত হইবার নয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর গদ্য, বীরবলী গদ্য, রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনা বাক্‌স্পন্দপ্রধান ; কমলাকান্তের দপ্তরও তাই। প্রত্যেকটারই আদর্শ মুখের ভাষা ; কোনোটাতে বেশি, কোনোটাতে কম এই মাত্র। গীতিস্পন্দের উদাহরণ গদ্যে বিরল। লিপিকার কোনো কোনো অংশ, রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার কোনো কোনো কবিতা গীতিস্পন্দপ্রধান।

বাংলা গদ্যে গীতিস্পন্দের প্রধান দৃষ্টান্তস্থল অবনীন্দ্রনাথের গদ্য। অবনীন্দ্রনাথের স্টাইলে যে স্বকীয়তার উল্লেখ করিয়াছিলাম তাহা এই-জন্যই। এ দিক দিয়া বাংলা সাহিত্যে একেবারে দ্বিতীয়রহিত না হইলেও নিঃসন্দেহ তিনি প্রধান।

সাহিত্যের এই গীতিস্পন্দ, বাক্‌স্পন্দ ও লেখনীস্পন্দের মধ্যে গীতিস্পন্দ প্রাচীনতম ; কারণ মানুষ কথা বলিবার আগে গান করিতে শিখিয়াছে, আর তাহার লিখিতে শেখা সে তো সেদিনের কথা। সে এত অল্পদিনের কথা যে কলমের সঙ্গে আজও তাহার সম্পূর্ণ বোঝাপড়া যেন হয় নাই ; মনের অনেক কথাই আজও মানুষ কলমে প্রকাশ করিতে অর্ধক্ষম মাত্র। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে, যাঁহারা লেখ্য ভাষা ও মৌখিক ভাষা লইয়া বিতর্ক বাধাইয়া থাকেন, তাঁহাদের মনে করাইয়া দেওয়া আবশ্যক, সাহিত্যের ভাষা দুইটি মাত্র নয়, তিনটি ; লেখ্য ভাষা ও মৌখিক ভাষার সঙ্গে গেয় ভাষাকে যোগ করিতে হইবে। আর, লেখ্য ও মৌখিক ভাষার মধ্যে প্রভেদ কেবল ক্রিয়াপদগঠনের মাত্র নয় ; ছন্দের প্রভেদ রহিয়াছে, আর ছন্দের প্রভেদ যে আছে তার কারণ ভাবের ও বিষয়ের প্রভেদ।

মানুষের প্রাচীনতম ভাবের বাহন গান, গদ্য পরবর্তী যুগের। আবার গদ্যের মধ্যে প্রাচীনতম— গীতিস্পন্দযুক্ত গদ্য। মানুষের অধিকাংশ রূপকথা এই গীতিস্পন্দের গদ্যে কথিত। কিন্তু রূপকথা যখন হইতে লিখিত হইতে আরম্ভ হইল, তখন গোলমাল বাধিল। যাহা গীতিস্পন্দে কথিত হইত লিখিবার সময়ে অনেক ক্ষেত্রেই তাহা লেখ্য ও মৌখিক ভাষায় লিপিবদ্ধ হইল, কদাচিৎ কখনো গীতিস্পন্দযুক্ত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। অবনীন্দ্রনাথের প্রধান কৃতিত্ব এই যে, তিনি রূপকথাকে রূপকথার ভাষায় অর্থাৎ গীতিস্পন্দের ভাষায় লিখিয়াছেন। তাঁহার পরিণত স্টাইলের মধ্যে বহুযুগের মায়ের কোলের দোল ও মাতামহীর মুখের সুর

সঞ্চিত হইয়া আছে ; তাঁহার রাজকাহিনী, নালক, ভূতপত্‌রীর(১৯১৫) গদ্য পঠিত হইবামাত্র এই সুর গুঞ্জরিত হইয়া উঠিয়া মানুষের শৈশবের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তখনই ব্যক্তির শৈশব আর মানুষের শৈশব এক সঙ্গে জড়িত হইয়া গিয়া নিবিড় রূপকথার অপরূপ রাজ্যের সৃষ্টি করিতে থাকে। রূপকথা-কথন কঠিন, আর রূপকথা-লিখন ?— অবনীন্দ্রনাথের রচনা না পাইলে অসম্ভব বলিয়াই মনে হইত।

আজকাল গণচৈতন্যপ্রসঙ্গে গণশিল্পের কথা শোনা যায়। কালীঘাটের পট নকল করিয়া ছবি আঁকা বা চাষার কাহিনী লইয়া গল্পনাটক রচনা গণশিল্প নয় ; কারণ, গণত্ব ঘটনার মধ্যে নাই ; যে-মন রচনা করিতেছে তাহার উপরেই সব নির্ভর করিতেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে লেখকের মন সাম্প্রদায়িক মন, সে মনের যোগ্য বাহন লেখ্য ভাষা। লেখাতে মানুষে মানুষে তফাত ; আবার অল্প লোক লিখিতে জানে, অধিকাংশই জানে না। অর্থাৎ লেখ্য ভাষা এমন একটা পথ যে-পথের সন্ধান 'গণ' জানে না, আর জানিলেও সে সংকীর্ণ পথে জনতার স্থান সংকুলান হইবে না। একমাত্র গানের প্রাচীনতম ও উদারতম জগন্নাথক্ষেত্রে সকল মানুষের স্থান আছে। যখন সমাজে শ্রেণীবিভাগ ঘটে নাই তখন হইতেই গানের সঙ্গে জাতিহিসাবে মানুষ পরিচিত, গানের মারফতে মানুষে মানুষে পরিচয় ; সে পরিচয় আজিও সুপ্তভাবে মানুষের মনে সঞ্চিত আছে, গানের সুরে তাহা জাগিয়া ওঠে ; জাগিয়া উঠিয়া শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের বাঁধ ভাঙিয়া সব একাকার করিয়া দিয়া মানবসমাজকে এক করিয়া দেয়। চাষার বিষয়ে লিখিত নাটক গণসাহিত্য নয়, এমন কি খাঁটি চাষার লিখিত রচনাও গণসাহিত্য নয়। কারণ সে পথ জনগণমনের পথ নয়। পরীক্ষা কঠিন নয়। গণনাটকের আসরে কোনো প্রকৃত 'গণ'কে বসাইয়া দিলে সে কিছুই বুঝিতে পারিবে না। আমাদের গণসাহিত্য নিতান্তই আমাদের জন্য লিখিত। রূপকথাই

প্রকৃত গণসাহিত্য এবং অবনীন্দ্রনাথ সেই গণসাহিত্যের রাজা। অবনীন্দ্রনাথ সমাজের যে স্তরে এবং যে ঘরেই জন্মিয়া থাকুন-না কেন, প্রতিভার রহস্যে তিনি দেশের সেই উদার ক্ষেত্রে জন্মিয়াছেন যেখানে দেশের সর্বশ্রেণীর আসন ; যেখানে দেশের মানুষ গল্পলিপ্সু, যেখানে গল্প শুনিবার লোভে সকল মানুষ বয়োভেদ ভুলিয়া চিরকালের শিশু। অভিজাতঘরের দক্ষিণের বারান্দায় গণসংগীত যে কি ভাবে গিয়া পৌঁছায় জানি না ; হয়তো যে দাসীদের দ্বারা শৈশবে তিনি পালিত হইয়াছিলেন, তাহাদের মুখের কাহিনীতে, গলার স্বরে রূপকথার দীক্ষা তিনি পাইয়া থাকিবেন, হয়তো মাতৃস্তন্যের সঙ্গেই রূপকথার রসপান করিয়াছিলেন ; হয়তো প্রতিভার দুর্ভেদ্য রহস্যের মধ্যে ইহার সূচনা ছিল। কিংবা শ্রেণীতে শ্রেণীতে অভিজাতে দরিদ্রে যে দুস্তর বাধা আমরা কল্পনা করিয়া থাকি তাহা সত্য নয় ; অন্তরঙ্গ কোনো মিল আছে, নতুবা কলিকাতার ধনীর ঘরে সমাজছাড়া ঘরের ঘরকুণো একটি বালক কোন্ মন্ত্রে গণসাহিত্যের রাজা হইয়া উঠিল! ইহার পরীক্ষাও কঠিন নহে। ভূতপত্‌রী, বুড়ো আংলা (১৯৪১), রাজকাহিনী পড়িয়া শোনাও, শ্রেণী-শিক্ষা-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলে বুঝিবে, বুঝিয়া আনন্দ পাইবে। অক্ষর-পরিচয়ের উপরে ইহাদের রস নির্ভর করে না। অক্ষরগুলা ইহাদের ন্যূনতম অংশ। এমন কথা বাংলা সাহিত্যের কখানি পুস্তক সম্বন্ধে বলা যায়! শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথের চেয়ে উচ্চতর আসনের অধিকারী হইতে পারেন ; কিন্তু সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথের গৌরব এই যে, সাহিত্যের আসরে তিনি নিম্নতম আসনে বসিয়াছেন, একেবারে মাটির উপরে, সম্রাট অশোকের মত। মাটির উপরে বসিয়া তিনি মাটির মানুষের মন কাড়িয়া লইয়াছেন, যে মাটিতে চিরকালের ফসল ফলে, মানুষের শিশু নিত্য ভূমিষ্ঠ হয়।

৩

গীতিস্পন্দপ্রধান গদ্যের উপজীব্য কি? বাক্যস্পন্দপ্রধান গদ্যে তর্কবিতর্ক করা চলে, তাহা সামাজিক মনের বাহন। লিখনস্পন্দপ্রধান গদ্যে চিন্তা করা চলে। গীতিস্পন্দপ্রধান গদ্যে গল্প বলা চলে; সে গল্প রূপকথার গল্প। রূপকথার গল্পে এবং অন্য গল্পে মূলে একটা স্থূল প্রভেদ আছে। অন্য গল্পের মত রূপকথায় রিয়ালিজ্‌মের স্থান নাই। আজ যাহা রিয়ালিজ্‌ম কাল তাহা রিয়ালিজ্‌ম-বর্জিত; সাহিত্যে নিত্যই একটা রিয়ালিজ্‌ম-বর্জনের প্রক্রিয়া চলিতেছে। কাহিনী হইতে রিয়ালিজ্‌মের বিষ ঝরিয়া গেলে তবেই তাহা রূপকথায় স্থান পাইবার যোগ্য হয়। এই রিয়ালিজ্‌ম-বর্জনের জন্য কিছু সময় দরকার। ঠিক কতটা সময় লাগিবে তাহা ইতিহাসের গতির উপরে এবং লেখকের শক্তির উপরে নির্ভর করে; সামান্য নিয়মের দ্বারা নির্দেশ করা চলে না। একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। নেপোলিয়নের জীবনী এবং ইতিহাস বাস্তব ব্যাপার। টলস্টয়ের ওয়র অ্যাণ্ড পীস্‌ উপন্যাসে তাহা একদফা রূপান্তরিত হইয়াছে। ইহা লিখনস্পন্দপ্রধান ভাষায় লিখিত। কারণ, এই গল্পের সূত্রে লেখক মানবজীবন সম্বন্ধে কতকগুলি চিন্তনীয় কথা বলিতে চাহিয়াছিলেন। আবার নেপোলিয়নের কাহিনী লইয়া ফরাসি কবি বেরেঞ্জার গান লিখিয়াছেন; তাহাতে অনুভূতির কথা আছে, চিন্তার কথা নাই। ইহা বাস্তব ঘটনার আর-এক রকম রূপান্তর। আবার এই একই কাহিনী হার্ডির হাতে দি ডাইনাস্ট্‌স্‌ কাব্যে জন্মান্তর পাইয়াছে। কিন্তু কোনোটাই রূপকথার পর্যায়ে পড়ে নাই। বরঞ্চ বেরেঞ্জারের কোনো কোনো গান রূপকথার সীমার মধ্যে যেন আসিয়া পড়িয়াছে। বেরেঞ্জারের একটি গানে আছে— একজন বৃদ্ধ সৈনিক, সে নেপোলিয়নকে দেখিয়াছিল, ছোট ছেলেদের গল্পচ্ছলে বলিতেছে, আমি তাঁহাকে এই গ্রামের মধ্য দিয়া বহু রাজার

দ্বারা অনুসৃত হইয়া যাইতে দেখিয়াছি। ইহা প্রায় রূপকথার পর্যায়ভুক্ত। নেপোলিয়নের ইতিহাস বাস্তববিষয়বর্জিত হইয়া একটি ছত্রে সত্যতর হইয়া উঠিয়াছে। সমগ্র ইতিহাসের অভিজ্ঞতা ওই একটি ছত্রে ঘনীভূত। রিয়ালিজ্ম সত্য; অতি-রিয়ালিজম বা সুপার-রিয়ালিজ্ম সত্যতর। রূপকথার কারবার এই সুপার-রিয়ালিজ্মের উপাদান লইয়া। কিন্তু নেপোলিয়নের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের রিয়ালিজ্ম এখনো সম্পূর্ণরূপে খসিয়া যায় নাই। ইউরোপের ইতিহাসে তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও রাষ্ট্রনীতি এখনো সক্রিয়। হয়তো পাঁচ শ বছর পরে কিংবা হাজার বছর পরে নেপোলিয়নের ব্যক্তিত্বের বিরাট ঈগলকে রূপকথার রূপার খাঁচায় ভরিবার সময় আসিবে। তখন নেপোলিয়ন আর সম্রাট থাকিবেন না, তিনি Jack the Giant-Killer জাতীয় একটা রূপকাহিনীতে পর্যবসিত হইবেন; যে বামন জ্যাক একাকী ইউরোপীয় বহুরাজক অরাজকতার দৈত্যকে বধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বস্তুত জ্যাক ও জায়েণ্টের কাহিনীর মূলে বহুযুগপূর্ববর্তী প্রচণ্ড একটা ঐতিহাসিক বাস্তব ঘটনা আছে; এখন তাহা প্রমাণের পরপারবর্তী অনুমানের রাজ্যে গিয়া পড়িয়াছে। প্রমাণের কম্পাসে রিয়ালিজ্মের সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়; রূপকথার রাজ্যের জাদুমন্ত্র-পড়া বাতায়ন হইতে যে দুস্তর সমুদ্র দেখা যায় তাহার একমাত্র কম্পাস— অনুমান।

যে কথা প্রমাণযোগ্য নয়, অনুমান যার একমাত্র সম্বল, তাহা লইয়া তর্কবিতর্ক করা চলে না, চিন্তা করা চলে না; কেবল সুরের দ্বারাই তাহা প্রকাশযোগ্য। সেইজন্য রূপকথার প্রধান সম্বল গীতিস্পন্দপ্রধান ভাষা।

অবনীন্দ্রনাথের সব কথাই রূপকথা। তাঁহার প্রথমতম গ্রন্থ হইতে শেষতম (আশা করি ইহাই শেষ নহে) জোড়াসাঁকোর ধারে অবধি সবই রূপকথা। তাঁহার সমস্ত রচনা যেন একখানা সুদীর্ঘ মসলিনের থান; ক্রমে ক্রমে অকুণ্ডলীকৃত হইয়া খুলিয়া চলিয়াছে। প্রথম দিকে

তার সুতাগুলি মোটা, বুনানি তেমন জমাট নয়; কিন্তু কালক্রমে তাহা সূক্ষ্মতর ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিয়াছে। আবার এই সাদা জমিনের উপর নানা রঙের ছাপ আছে। কোনোখানে ক্ষীরের পুতুল (১৮৯৬), শকুন্তলার (১৮৯৫) ছাপ; কোনোখানে বা নালক, রাজকাহিনীর ছাপ; শেষের দিকে সুতা যেখানে অতিশয় সূক্ষ্ম সেখানে ভূতপত্‌রী, খাতাঞ্চির খাতা (১৯২১), বুড়ো আংলার ছাপ; শেষ দুইটি ছাপ দেখিতেছি ঘরোয়া এবং জোড়াসাঁকোর ধারের। এই মসলিনের থানের সবটাই একই হাতের বুনন বলিয়া ইহার যে-কোনো অংশ সমগ্রের স্বাদ দিতে সক্ষম। অবনীন্দ্রনাথের সব রচনার একই রস বলিয়া কোনো একখানা বই পড়িলে একরকম সব বই পড়ার কাজ হইয়া যায়।

ক্ষীরের পুতুল তো প্রকৃত রূপকথার বস্তু। কালিদাসের শকুন্তলা রূপকথা নয়; কিন্তু দীর্ঘ কালাতিপাতের ফলে শকুন্তলা-কাহিনী এখন রূপকথার বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। রাজকাহিনীর কাহিনী ঐতিহাসিক; ইচ্ছা করিলে ঐতিহাসিকের অনুবীক্ষণ যোগে ইহা দেখা যাইতে পারে, তাহাতে ইতিহাসের রস পাওয়া যাইবে। কিন্তু লেখক ঐতিহাসিকের অনুবীক্ষণ ফেলিয়া রূপকথার দূরবীক্ষণ চোখে লাগাইয়াছেন; ফলে কাছের জিনিস তথ্য বর্জন করিতে করিতে দূরে সরিয়া গিয়া রূপকথার রাজ্যে রূপান্তরিত হইয়াছে (দূরবীক্ষণ দূরের জিনিস কাছে টানিয়া আনে; ওটা রিয়ালিজ্‌মের সত্য)। ভূতপত্‌রী, খাতাঞ্চির খাতার বুনানি এতই সূক্ষ্ম যে, আছে কি না সন্দেহ হয়; বৈদেশিক রূপকথার রাজার সেই নূতন পোশাকের কথা মনে করাইয়া দেয়। বুড়ো আংলার কাহিনী মূলত বিদেশি হইলেও মনে রাখিতে হইবে রূপকথায় দেশ-বিদেশের রিয়ালিজ্‌ম-গত প্রভেদ নাই। সেখানে সব দেশই এক দেশ; সব মানুষই এক মানুষ, অর্থাৎ শিশু। রূপকথার রাজ্যই আন্তর্জাতিকতা-বাদীদের পরিকল্পিত অখণ্ড পৃথিবী; রূপকথার শ্রোতা শিশুই

আন্তর্জাতিকতাবাদীদের পরিকল্পিত জাতিসম্প্রদায়-ধর্ম-দেশ-বিমুক্ত মানব ; রূপকথার সত্যযুগ ইতিহাসের বিস্তৃতির পরপারবর্তী অতীত কালে, কোনো অনিশ্চিত ভবিষ্যতে নয়।

কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের সবচেয়ে কৃতিত্ব এই যে, ঘরোয়া ও জোড়াসাঁকোর ধারের সমসাময়িক ইতিহাসকে তিনি রূপকথায় পরিণত করিয়াছেন। এ কেমন করিয়া সম্ভব হইল ? আগে বলিয়াছি যে, রূপকথায় পরিণত হইতে বাস্তবের কিছু সময় লাগে, কিন্তু ঠিক কতটা সময় লাগে তাহা বলি নাই, কারণ তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। জোড়াসাঁকোর ইতিহাস সমসাময়িক হইলেও তাহার এত শীঘ্র রূপকথায় রূপান্তরিত হইবাব অনুকূলে কিছু কারণ আছে।

প্রথমত, জোড়াসাঁকোর ইতিহাসের প্রথম অঙ্ক বাংলাদেশের একটা বিগত যুগের কথা। সে যুগ অল্পদিন গত হইলেও ইতিমধ্যেই যেন বহুযুগ আগে গিয়া পড়িয়াছে। সেদিনের পল্লী-কলিকাতার সঙ্গে আজকার যান্ত্রিক-কলিকাতার যে প্রভেদ তাহা কেবল সময়ের নহে, দুই জীবনভঙ্গির প্রভেদ। পল্লীর জীবনভঙ্গি হইতে আজ আমরা বহুদূরে চলিয়া আসিয়াছি ; দুই-তিন পুরুষকালের মধ্যে বহুকালের তফাত ঘটিয়া গিয়াছে ; প্রায় 'এই জনমে ঘটালে মোর জন্মজনমান্তর' গোছের। দুইয়ের রসই আলাদা হইয়া গিয়াছে। লেখক এই রসভেদের সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন।

দ্বিতীয়ত, সময়ের দূরত্বের উপরে ইতিহাসের ঘটনা ঘনীভূত হইয়া চাপিয়া বসিয়া তাহাকে নূতন অর্থ, নূতনতর দূরত্ব দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ নামে একটি শিশুর জন্ম হইতে রবীন্দ্রনাথ নামে মহাকবির মৃত্যু সামান্য কয়েক বছরের মধ্যে (রিয়ালিজ্‌ম বলে, আশি বছর কয়েক মাস) এই বাড়িতে ঘটিয়া গিয়াছে। ইহা যে কত বড় পৃথিবী-নাড়া-দেওয়া ঘটনা তাহা চোখে দেখিয়াছি বলিয়াই বিশ্বাস

হইতেছে না, বিস্ময় বোধ হইতেছে না। চোখে না দেখিয়া ইতিহাসে পড়িলে বিস্ময়ের অন্ত থাকিত না। এই সামান্য আশি বছরের উপর অনেক শতাব্দীর ভার যেন ঘনীভূত। সামান্য অঙ্গারের উপর ভূস্তরের দুর্বহ চাপ পড়িয়া হীরকের সৃষ্টি করে। সামান্য কয়েক বছরের উপর বহু শতাব্দীর নিহিতার্থ ঘনীভূত হইয়া একটা পারিবারিক কাহিনীকে রূপকথার অলৌকিকত্ব দান করিয়াছে। অঙ্গার প্রকৃতির রিয়ালিজ্‌ম; প্রকৃতির রূপকথা হীরক।

তৃতীয়ত, লেখকেব বিশেষ সাহিত্যিক গুণ।

৪

সাহিত্যিক হিসাবে অবনীন্দ্রনাথ যে সাধনোচিত মর্যাদা পান নাই তার অন্যতম কারণ, পাঠকে তাঁহাকে শিশুসাহিত্যিক মাত্র মনে করে, যেন শিশুসাহিত্যিক সাহিত্যিক শিশু, নিতান্তই নাবালক। আর, একবার নাবালক বলিয়া ধরিয়া লইলে কিছুতেই তাহাকে সাবালকের আসনটি দিতে মন সরে না। কিন্তু মনে রাখা উচিত, পৃথিবীর অধিকাংশ সাহিত্যিক রচনাই শিশুসাহিত্য, অধিকাংশ সার্থক রচনা তো বটেই। এমন যে হয় তার কারণ, মানুষমাত্রেই মূলত শিশু, গল্প-শোনার শৈশব তার কিছুতেই কাটে না। এ সেই সিন্দবাদের স্কন্ধারোহী বৃদ্ধের বিপরীত আখ্যান। মানুষমাত্রেই সিন্দবাদ, কেবল বার্ধক্যের বদলে প্রত্যেকে নিজের শিশুসত্তাকে বহন করিয়া জীবনের পথে চলিয়াছে। সাহিত্যের সংবেদন এই শিশুটার প্রতি। তা ছাড়া অপর সংবেদনও অবশ্য আছে। শিশুর বয়স বাড়িবার সঙ্গেসঙ্গে তাহার উপরে নানা রকম সংস্কারের স্তর জমিয়া উঠিতে থাকে এবং শেষে এমন এক সময় আসে যখন ভিতরের শিশুটি বাহিরের স্তরবাহুল্যে চাপা পড়িয়া যায়। পদ্মের পাপড়ি একটির পর একটি খসাইয়া লইলে ভিতরের বীজকোষটিকে অব্যাহত দেখা

যাইবে। সেই বীজকোষটিই মানুষের অন্তর্নিহিত শিশুসত্তা। অবশ্য, অনেক সময়ে সংস্কারের চাপে শিশুর মৃত্যু ঘটে। তাহারা নিতান্ত দুর্ভাগা ; ভালো মন্দ কোনো সাহিত্যের সংবেদনই তাহাদের প্রতি নাই। নিম্নশ্রেণীর সাহিত্যের সংবেদন কেবল সংস্কারের স্তরগুলির উপর। প্রচারসাহিত্য এই শ্রেণীর অন্তর্গত। শাশ্বত (classics) শ্রেণীর সাহিত্যের সংবেদন স্তরগুলির উপরেও, আবার এইসব স্তরোত্তীর্ণ শিশুটির প্রতিও। আর, রূপকথা-সাহিত্যের প্রধান সংবেদন সরাসরি স্তরাতিক্রমী শিশুটির প্রতি। এ দিক দিয়া শাশ্বত সাহিত্যে ও রূপকথায় ঘনিষ্ঠ ঐক্য ; দুইয়ের মধ্যে সংবেদনের সাম্যে গোড়ায় একটা মিল আছে। সেইজন্যই দেখা যায় যে, পৃথিবীর অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ বই শিশুসাহিত্য না হইয়াও শিশুদের চিরপ্রিয়। ডন-কুইক্সোটের ইতিহাস, গালিভারের ভ্রমণ, রবিন্‌সন্ ক্রুশোর কাহিনী, লা ফঁতেনের উপকথা, পিক্‌উইকের কীর্তিকাহিনী, পঞ্চতন্ত্র ও কথাসরিৎসাগর এই জাতীয় গ্রন্থ। আবার অনেকগুলি বিখ্যাত বই যাহা প্রধানত শিশুসাহিত্য নামে পরিচিত তাহা বয়স্কদেরও প্রিয়। দেশ-বিদেশে-প্রচলিত রূপকথার কথাই ভাবিতেছি। হ্যান্‌স্ অ্যাণ্ডারসন কর্তৃক সংগৃহীত গ্রন্থ এই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কোনো বই সত্যই শিশুসাহিত্য কি না তাহার প্রধান পরীক্ষা তাহা বয়স্কদের পাঠ্য কি না। কোনো বইয়ে যদি শিশুমনের প্রতি প্রকৃত সংবেদন থাকে তবে তাহার বয়স্কের সংস্কারের স্তর ভেদ করিবার সামর্থ্যও থাকে। তাহার সে ক্ষমতা না থাকিলে তাহা নিশ্চয় শিশুসাহিত্য নয়। কোনো শিশুর ভালো লাগিলেও লাগিতে পারে, চিরশিশুর কখনোই ভালো লাগিবে না। এই মনের দ্বারা বিচার করিলে বলিতে হইবে, অবনীন্দ্রনাথের বই শ্রেষ্ঠ অর্থে শিশুসাহিত্য, অর্থাৎ তাহা একাধারে শিশুর ও বয়স্কের, অর্থাৎ মানুষের অন্তঃস্থ চিরশিশুর, প্রিয়। তাঁহার রাজকাহিনী, নালক, ভূতপত্‌রী কোন্ শিশুর না প্রিয়? কোন্ বয়স্কের না প্রিয়?

এমন বয়স্ক যদি কেহ থাকে যে তাহার এসব বই প্রিয় নয়, তবে বুঝিতে হইবে নানা সংস্কারের চাপে তাহার চিরশিশুর মৃত্যু ঘটিয়াছে। অবনীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের শিশুসাহিত্যের বাদশাহ এবং সেই কারণেই তিনি বয়স্কের সাহিত্যের রাজা।

৫

রূপকথার রূপ শব্দটির অর্থ কি? বিশেষ কোনো অর্থ আছে, না, উপকথার উচ্চারণ অপভ্রংশে এমনটি দাঁড়াইয়াছে? যেমনি হোক, রূপকথায় একটি বিশেষ ইঙ্গিত আছে যাহা উপকথায় নাই। রূপকথা কাহিনীর পট মেলিবার সঙ্গেসঙ্গে চোখের সমুখে একটা রূপের সৃষ্টি করিতে থাকে; এই রূপসৃষ্টির সার্থকতার জন্য ইহার নাম রূপকথা। কিন্তু ইহা তো বিশেষ ভাবে রূপকথার লক্ষণ নয়। সাহিত্যমাত্রেরই কাজ রূপের সৃষ্টি, তবে রূপকথার জন্য এই সামান্য লক্ষণের দাবি করি কি ভাবে। কিন্তু তবু একটু প্রভেদ আছে। রূপকথা কেবল রূপেরই সৃষ্টি করে। অন্যান্য কাব্যসাহিত্য রূপেরও সৃষ্টি করে, সঙ্গেসঙ্গে অন্য রসেরও সৃষ্টি করে; পাঠকের চিন্তার উদ্রেক করে, পাঠকের ইচ্ছাশক্তিকে জাগ্রত করে। রূপের বেসাতি তাহার একমাত্র কাজ নয়; তাহার কাজ অনেক জটিল। সেইজন্যই তাহা বিশেষ ভাবে রূপকথা নয়। রূপকথার ও শাশ্বত সাহিত্যের মিলের উল্লেখ করিয়াছি; সে মিলটা এইখানে, রূপসৃষ্টিতে। অমিলের উল্লেখও করিয়াছি, তাহাও এইখানে; রূপকথার লক্ষ্য মাত্র একটি, অন্য সাহিত্যের লক্ষ্য একাধিক, কেবল রূপসৃষ্টি করিলে তাহার চলে না। চলে যে না, তার কারণ অন্য সাহিত্য বয়স্ক মানুষের জন্য সৃষ্টি; তাহার চাহিদা বিস্তর, কেবল রূপবিস্তার করিয়া তাহার চোখকে তৃপ্ত করিলে চলে না, তাহার চিৎশক্তিকে, তাহার ইচ্ছাশক্তিকে খোরাক জোগাইতে হয়; তাহার

নানা সংস্কারকে পোষণ করিতে হয়। শিশুমনের চাহিদা অনেক সরল, কেবল রূপসৃষ্টি করিয়া তাহার চোখদুটিকে তৃপ্ত করিতে পারিলেই আর কিছু সে চাহে না। রূপকথার প্রধান লক্ষণ নিছক রূপসৃষ্টি।

রূপকথার দ্বিতীয় লক্ষণ উহাতে দেশ ও কালের কৈবল্য-সাধন। বিশিষ্টলক্ষণযুক্ত দেশহীনতা এবং কালহীনতা ইহার প্রধান সহায়। অর্থাৎ রূপকথার ভূগোল ও ইতিহাস নাই। সব দেশের বাহিরে কোনো দেশে রূপকথার লীলা। আর, কালের স্রোত সেখানে স্তব্ধ। সেখানে বয়স হয় তো বাড়ে, কিন্তু স্বভাব বদলায় না; বড়জোর শিশুর বয়স বাড়িয়া সেখানে চিরশিশুতে রূপান্তরিত হয়। ডন্‌কুইকসোট্ ও পিক্‌উইক এই সময়হীন সময়ের অধিবাসী; তাহাদের বয়স হয়তো বাড়িয়াছে কিন্তু স্বভাবের পরিবর্তন হয় নাই।

রূপকথার জগৎ বিশিষ্টার্থে দেশহীন ও কালহীন বলিয়াই এখানে কিম্ভূত-রস বা আজগবি-রসের সৃষ্টি এমন সহজ। কিম্ভূত-রস আর কিছুই নয়, জীবনের স্বাভাবিক তালপরিবর্তনই কিম্ভূত-রস। যে তালে আমরা প্রাত্যহিক জগতে পা ফেলি কিম্ভূত-জগতের পা ফেলার তাল তাহা হইতে স্বতন্ত্র। প্রাত্যহিক দেশ ও কালকে বিদায় করিয়া দিয়া এই স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি করা হয়।

অবনীন্দ্রনাথের রচনা হইতে সবগুলি লক্ষণেরই দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। রাজস্থানের বীরপুরুষ ও রমণীরা ইতিহাসের এক বিশেষ সময়ের লোক। কিন্তু রাজকাহিনীর জগতে আসিয়া যখন তাঁহারা প্রবেশ করিতেছেন তখন তাঁহারা কালোত্তীর্ণ দেশোত্তীর্ণ ব্যক্তি; তাঁহারা রূপকথার মানুষ। তখন আর তাঁহাদের বয়সের প্রশ্ন, স্বভাবের প্রশ্ন মনেই ওঠে না। সংসারে মানুষ জীবনযাপন করে; যাপন শব্দের মধ্যে গতির ইঙ্গিত আছে। কিন্তু রূপকথার জগতে নরনারী লীলা করে মাত্র; লীলার

মধ্যে চঞ্চলতা আছে, কিন্তু গতি নাই। গতি স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যায়, চঞ্চলতা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আবার পুরাতন স্থানেই লইয়া আসে; কিন্তু চঞ্চলতা আছে বলিয়াই পূর্বতন পুরাতন হয় না, তাহাকে বলি আমরা নিত্য।— ইহার অপর নাম নৃত্য। রূপকথার জগৎ নৃত্যের জগৎ, প্রাত্যহিক জগৎ শতগজি দৌড়ের জগৎ; এই সংস্কারের আধুনিক নাম প্রগতি।

আবার কিম্ভূত-রসের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ভূতপত্‌রীর দেশে, খাতাঞ্চির খাতায়, বুড়ো আংলাতে। ভূতপত্‌রীর দেশ উলটা-ছায়ার দেশ; জীবনের সত্য তাহাতে আছে, কেবল উলটাভাবে মাত্র আছে; এই উলটাকে স্বাভাবিক করা হইয়াছে দেশ ও কালের স্বভাবকে গোড়া হইতেই বর্জনের দ্বারা। সেখানে পালকি চলে কিন্তু এগোয় না; সেখানে উপরে উঠিতে হইলে নীচে নামিতে হয়, সেখানে চোখ মেলিয়া ঘুমানো, আবার তাকাইয়া থাকিলে তবেই ঘুম পায়।

এমন কি পথে-বিপথের (১৯১৯) মত বই, যাহার অধিকাংশ গল্পই গঙ্গায় স্টিমারে-বেড়ানোর গল্পমাত্র, লেখকের কলমের জাদুকাঠিতে তাহাও রূপকথার সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। ইহা অতিশয় কঠিন কাজ। এক পা সত্যের নৌকায় আর-এক পা রূপকথার নৌকায় রাখিয়া চলার মত কঠিন কাজ আর কিছু আছে বলিয়া জানি না। আনাড়ির যাহাতে পদে পদে পতনের আশঙ্কা, অবনীন্দ্রনাথের তাহাতে ওস্তাদির অন্ত নাই। স্বপ্ন ও সত্যের মিশ্রণে তাঁহার যেমন কৃতিত্ব এমন আর কিছুতে নয়; এই বিষম ধাতুতে তৈয়ারি তাঁহার ভূতপত্‌রীর দেশ বুড়ো আংলা, খাতাঞ্চির খাতা; এমন কি পথে-বিপথেও এই বিষমের রচনা। সত্য কথা বলিতে কি, অবনীন্দ্রনাথ সত্য ও স্বপ্নের সীমান্তপ্রদেশের লেখক; এই দুই জগতের খবর তাঁহার রচনায় যেমন পাই, এমন তো আর কোথাও দেখি না।

৬

সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনা করিয়া সাহিত্যরস বুঝানো সম্ভব নয়। তবু সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনার প্রয়োজন আছে। কারণ, রসবিচারই সাহিত্যের একমাত্র বিচার নয়। সাহিত্যক্ষেত্রে তত্ত্ববিচার গৌণ, রসবিচার মুখ্য। আবার রসবিচারের প্রকৃষ্টতম পন্থা রচনাপাঠ। রচনা-পাঠ ছাড়া আর কোনো উপায়েই রচনার উপলব্ধি সম্ভব নয়। এবারে অবনীন্দ্রনাথ হইতেই কোনো-কোনো অংশ উদ্ধার করিয়া তাঁহার যথার্থ পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব—

পুষ্পবতী যত্ন ক'রে নিজের কালো চুলের চেয়ে মিহি, আগুনের চেয়ে উজ্জ্বল, একগাছি সোনার তার, সরু হতেও সরু একটি সোনার ছুঁচে পরিয়ে একটি ফোঁড় দিয়েছেন মাত্র, আর চাঁপার কলির মতো পুষ্পবতীর কচি আঙুলে সেই সোনার ছুঁচ বোলতার হুলের মতো বিঁধে গেল!

যন্ত্রণায় পুষ্পবতীর চোখে জল এল; তিনি চেয়ে দেখলেন, একটি ফোঁটা রক্ত জ্যোৎস্নার মতো পরিষ্কার সেই রুপোর চাদরে রাঙা এক টুকরো মণির মতো ঝক্ঝক্ করছে। পুষ্পবতী তাড়াতাড়ি নির্মল জলে সেই রক্তের দাগ ধুয়ে ফেলতে চেষ্টা করলেন; জলের ছিটে পেয়ে সেই এক বিন্দু রক্ত ক্রমশ ক্রমশ বড় হয়ে, একটুখানি ফুলের গন্ধ যেমন সমস্ত হাওয়াকে গন্ধময় করে, তেমনি পাতলা ফুরফুরে চাদরখানি রক্তময় করে ফেললে।· ·

· ·হঠাৎ সন্ধ্যার অন্ধকারে ডানার একটুখানি ঝটাপট্ সেই ঘুমন্ত শিকৃরে পাখির কানে পৌঁছল, সে ডানা ঝেড়ে ঘাড় ফুলিয়ে বাদশার হাতে সোজা হয়ে বসল। আল্লাউদ্দিন বুঝলেন, তাঁর শিকারী বাজ নিশ্চয়ই কোনো শিকারের সন্ধান পেয়েছে। তিনি আকাশে চেয়ে দেখলেন, মাথার উপর দিয়ে দুখানি পান্নার টুকরোর মতো

এক-জোড়া শুক-শারী উড়ে চলেছে। বাদশা ঘোড়া থামিয়ে বাজের পা থেকে সোনার জিঞ্জীর খুলে নিলেন; তখন সেই প্রকাণ্ড পাখি বাদশার হাত ছেড়ে নিঃশব্দে অন্ধকার আকাশে উঠে কালো দুখানা ডানা ছড়িয়ে দিয়ে শিকারীদের মাথার উপরে একবার স্থির হয়ে দাঁড়াল, তার পর একেবারে তিন শ' গজ আকাশের উপর থেকে, একটুকরো পাথরের মতো সেই দুটি শুক-শারীর মাঝে এসে পড়ল। —রাজকাহিনী

রূপকথার প্রধান দায়িত্ব রূপের বা ছবির সৃষ্টি। উদ্ধৃত অংশ দুটিতে ছবি কি নিখুঁত; আর সে ছবির রঙের ছায়াতপের কি সুষমা। শুকশারীর রং পান্নার চেয়ে গাঢ়, কিন্তু ঘননীল আকাশের পটে তাহাদের ফিকে দেখাইতেছে; তাহাদের রং তুলনায় লঘুতর হইয়া পান্নার স্বচ্ছতায় নামিয়া আসিয়াছে।

পদ্মিনী কাহিনীতে অধরাত্রে চিতোরেশ্বরীর আবির্ভাব এবং সখীসহ পদ্মিনীর জৌহর ব্রতে আত্মবিসর্জন, পাঠককে আর একবার পড়িতে অনুরোধ করি। এ দুটিও রূপসৃষ্টি, কিন্তু একটি কি করুণ, আর-একটি কি ভয়ংকর— গা ছম্ ছম্ করিয়া ওঠে।

নালকের একটি বর্ণনা—

সন্ধ্যাবেলা। নীল আকাশে কোনোখানে একটু মেঘের লেশ নেই, চাঁদের আলো আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত নেমে এসেছে, মাথার উপর আকাশগঙ্গা এক টুকরো আলোর জালের মতো উত্তর থেকে দক্ষিণ দিক পর্যন্ত দেখা দিয়েছে। দেবল ঋষি গ্রামের পথ দিয়ে গেয়ে চলেছেন 'নমো নমো গোতমচন্দ্রিমায়'; মায়ের কোলে ছেলে শুনছে 'নমো নমো গোতমচন্দ্রিমায়'; ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে মা শুনছেন 'নমো নমো'; বুড়ি দিদিমা ঘরের ভিতর থেকে শুনছেন 'নমো'; অমনি তিনি সবাইকে ডেকে

বলছেন, ওরে নোমো কর্। গ্রামের ঠাকুরবাড়ির শাঁখ-ঘণ্টা ঋষির গানের সঙ্গে এক তানে বেজে উঠছে, নমো নমো! রাত যখন ভোর হয়ে এসেছে, শিশিরে ধুয়ে পদ্ম যখন বলছে নমো, চাঁদ পশ্চিমে হেলে বলছেন নমো, সমস্ত সকালের আলো পৃথিবীর মাটিতে লুটিয়ে পড়ে যখন বলছেন নমো, সেই সময়ে ঘুম ভেঙে নালক উঠে বসেছে আর অমনি ঋষি এসে দেখা দিয়েছেন।

আবার জোড়াসাঁকোর ধারের পনেরো অধ্যায়ে গঙ্গার যে ছবি আছে তাহা পাঠককে বারংবার পড়িতে অনুরোধ করি। একবার এই ছবির মাধুর্যের জন্য, দ্বিতীয়বার অবনীন্দ্রনাথের মনের পরিচয় পাইবার জন্য। বার-দুই পড়িলে আরও পড়িতে হইবে, এমনি মোহ আছে এই ছবিতে, এমনই মোহ আছে অবনীন্দ্রনাথের সব লেখায়। গঙ্গাকে এমন করিয়া আর কে দেখিয়াছে; গঙ্গাকে আর কে এমন ভালোবাসিয়াছে। ভক্তরা শুধু মন দিয়া গঙ্গাকে দেখে; আর এই শিল্পী-ভক্ত সুরধুনীকে মন দিয়া, প্রাণ দিয়া, চোখ দিয়া দেখিয়াছেন; তাই তো অবনীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করিয়াছেন—

> তারা [আধুনিক ভারতীয় শিল্পী] ভারতকে দেখতে শেখে নি, দেখে নি। এ আমি অতি জোরের সঙ্গেই বলছি। আমি দেখেছি, নানারূপে মা-গঙ্গাকে দেখেছি।

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পরীতিতে নানা দেশের প্রভাব থাকিতে পারে কিন্তু এমন ভারত-দেখা চোখ, ভারত-ঘেঁষা মন, দেশ-ভালোবাসা প্রাণ আর কোথায়? তিনি একান্তভাবে ভারতীয় বলিয়াই নানা রীতির প্রভাব সহ্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কারণ, মূলে এক জায়গায় সংকীর্ণ না হইলে বৃহৎকে গ্রহণ করা যায় না। মৌলিক সেই সংকীর্ণতার নামই ব্যক্তিত্ব। কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার শেষতম দুইখানি বইয়ে আসিয়া

পড়িয়াছি, ঘরোয়া ও জোড়াসাঁকের ধারে। নানা কারণে এ দুখানি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

৭

অবনীন্দ্রনাথের রচনাবলীর মধ্যে ঘরোয়া ও জোড়াসাঁকোর ধারে বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই দুইখানিতে তাঁহার রচনারীতি চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে এবং এই দুইখানিতে একাধারে শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ও সামাজিক মানুষ অবনীন্দ্রনাথের জীবনকথা লিপিবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলা, এবং অবনীন্দ্রনাথের ঘরোয়া ও জোড়াসাঁকোর ধারে এই চারখানি বইয়ে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সামাজিক ইতিহাস পাওয়া যায়। যে আবহাওয়ার মধ্যে লোকোত্তর দুইজন মনীষী জন্মিয়াছেন, বাড়িয়া উঠিয়াছেন, যে আবহাওয়ায় তৎকালীন নব্যবঙ্গসংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, এই বই-চারখানি তাহার ইতিহাস বুঝিতে যেমন সাহায্য করে এমন আর কোথায়? যে যুগে ইঁহারা জন্মিয়াছিলেন সে যুগ এখন ইতিহাসের অঙ্কগত, সে ঘটনার পরিণাম প্রায় পঞ্চম অঙ্কের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে : যবনিকা পড়ি-পড়ি করিতেছে, বিদায়ঘণ্টার ধাতুফলক লক্ষ্য করিয়া ঘণ্টাবাদকের নির্মম হস্ত উদ্যতপ্রায়। সে যুগ ছিল ময়লা চাদরের, পাদুকাহীন কর্দম-অঙ্কিত পায়ের; সে যুগ ছিল ঝাড়লণ্ঠনের, প্রশস্ত জাজিম-পাতা উদার ফরাশের। মৌচাকের মত কক্ষবহুল বাড়িগুলি নিকট ও দূর আত্মীয়স্বজনের উপস্থিতিতে মৌচাকের মতই গুঞ্জনমুখর থাকিত। মূল্যবান চেয়ারের অনমনীয় সংকীর্ণতা তখনো আহ্বানের উদারতাকে সংকুচিত করিয়া তোলে নাই। আধুনিক সভ্যতার সদাগরপুত্রের জাহাজখানা সবে ঘাটে আসিয়া ভিড়িয়াছে, সে তখনো ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিয়া আপনকে পর করিবার সর্বনাশা মন্ত্রে সকলকে স্বার্থপরতার দীক্ষাদান করিতে সমর্থ হয় নাই। শহর ও পল্লী

তখনও শৈশবের ঐক্য ঘুচাইয়া এমন নিষ্ঠুর স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে নাই। কেবল রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ যে সেই সময়ের মানুষ এমন নয়, যে নব্যবঙ্গসংস্কৃতির গৌরব আমরা করিয়া থাকি তাহাও সেই যুগের স্তন্যে লালিত। এই যুগের সামাজিক মনের ও মনের প্রতিক্রিয়ার পরিচয় যেমন এই বইগুলিতে আছে বাংলা সাহিত্যে তেমন আর কোথাও দেখি নাই। এবং এই দিক দিয়া বিচার করিলে বই-চারখানা বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসের একটা সময়ের দলিলরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু দলিল হিসাবে যে মূল্যই ইহাদের থাকুক, ইহাদের মুখ্য মূল্য সাহিত্য হিসাবে। এই মুখ্য ও গৌণ রূপ মিলাইয়া ইহাদের গ্রহণ করিতে হইবে।

সেকালের জোড়াসাঁকোর বাড়ির যে ছবি জোড়াসাঁকোর ধারে ও ঘরোয়াতে পাই, তাহার তুলনা নাই। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি বাংলা সাহিত্যের ক্ষুধিত পাষাণের প্রাসাদ। বাংলাদেশের প্রভাতের আশা এবং অপরাহ্নের ম্লানিমা এখানে অঙ্গাঙ্গীভাবে বিরাজমান। এই প্রাসাদ এককালে পুরাতন আভিজাত্যের বিবিক্ত উদারতা দেখিয়াছে, আবার নবজাগ্রত মধ্যবিত্তশ্রেণীর স্থূল কর্মোদ্যমেরও ইহা সাক্ষী। গত দেড় শ বছরের কলিকাতার কোন্ ধনী মানী জ্ঞানী, কোন্ অভিজাত-না এই বাড়িতে সম্ভ্রমে শ্রদ্ধায় গৌরবে পদার্পণ করিয়াছেন; আবার নূতনক্ষমতাপুষ্ট মধ্যবিত্তসম্প্রদায় সেদিন শোকের শ্রাবণের অপরাহ্নে বাঁধভাঙা বন্যার উচ্ছ্বাসে প্রবেশ করিয়া সমগ্র জাতির সম্মিলিত অশ্রুর প্রবাহে কবিগুরুর মৃতদেহ ভাসাইয়া লইয়া গেল, এই প্রাসাদ সেই যুগলক্ষণাক্রান্ত ঘটনারও সাক্ষী। প্রাচীন পল্লী-কলিকাতার কেন্দ্রশায়ী এই প্রাসাদ আধুনিক যন্ত্রগঠিত কলিকাতার একান্তশায়ী। ইহা আর কেবল ধনীপরিবারমাত্রের বাস্তুভিটা নয়, ইহা দুই যুগের প্রত্যন্তসীমায় প্রহরীরূপী দুর্গপ্রাসাদ।

রূপকথার ওস্তাদ শিল্পীর কলম-তুলির স্পর্শে এই বাড়ির কর্তা-মনিব আত্মীয়-আগন্তুক চাকর-দাসী, মায় গাছপালাগুলি পর্যন্ত জীবন্ত, রূপকথার অলৌকিকতায় সমৃদ্ধ। দক্ষিণের বারান্দায় পুরুষানুক্রমে চৌকি পাতিয়া বসা; একদিন বাড়ির ছোট ছেলেটি বয়স্কদের আনাচে কানাচে ঘুরিত, কিছুকাল পরে সে আবার বয়সের গৌরবে চেয়ার অধিকার করিয়া বসিল, তাহার পায়ের কাছে ছেলেরা আবার তেমনি করিয়া ঘোরা-ফিরা করে; দক্ষিণের বারান্দার প্রবীণ শিল্পীর পায়ের কাছে ক্রমে ক্রমে নবীন শিল্পীদের ভিড় জমিতে থাকে; ও-বাড়ির তেতলার ছাদে সন্ধ্যাবেলায় আসর জমে, কিশোর কবির নবীন গান; গভীর রাত্রে তেতলার ছাদে দীর্ঘছায়ানিক্ষেপী বাণীর ছায়াপ্রতীকের মত যুবক কবির নিঃশব্দ পদচারণ; শরৎকালের প্রভাতে চাদরের প্রান্তে একমুঠা বেলফুল বাঁধিয়া দক্ষিণের বারান্দায় কবির নীরব বৈতালিক; দক্ষিণের বারান্দায় স্বপ্নপ্রয়াণ-পাঠরত কবির ও রসিক শ্রোতা রাজনারায়ণ বসুর উচ্চকিত অট্টহাস্য ও-বাড়ির বালক দূর হইতে শুনিতে পায়; ও-বাড়ির বালক-শিল্পী উঁকি মারিয়া দেখিতে পায়, এ-বাড়ির বারান্দায় দ্বিপ্রহরের আহারান্তে কর্তা-দাদামহাশয় আলবোলায় ধূমপান করিতেছেন; কখনো দেখিতে পায়, শালের পাগড়ির তলে বঙ্কিমচন্দ্রের ললাট ও মুখমণ্ডল; এ-বাড়ির বালক-কবি দেখিতে পায়, ও-বাড়ির নাচঘর আলোয় আলোময়; দেউড়িতে জুড়িগাড়ির ভিড়; নাচঘর হইতে উচ্ছ্বসিত গানের সঙ্গে হাসির শুভ্র ফেনা; দক্ষিণের পুকুরপাড়ে নানা প্রকৃতির স্নানার্থীর জনতা; পুরানো বটের প্রতিদিন নূতন ছায়ানিক্ষেপ; দক্ষিণের বাগানে বিকালবেলা চৌকি পাতিয়া ও-বাড়ির কর্তাদের আসর জমিয়া ওঠে; ফোয়ারার জল পিচকারি ছোঁড়ে, আর কৃত্রিম হাঁসের দল ভাসিয়া বেড়ায়।

যুগে যুগে কত-না আগন্তুক এই বাড়িতে! পালকি হইতে দেওয়ানজীর

অবতরণ ; চটি-চাদরে বিদ্যাসাগর ; ভাঙা গলায় টানা সুরে মাইকেলের মেঘনাদবধ-আবৃত্তি ; আত্মনিমগ্ন বিহারীলালের সারদামঙ্গলের স্বগতভাষণ ; তানপুরা-মাত্র-সঙ্গী শ্রীকণ্ঠ সিংহ ঘরে ঘরে গান গাহিয়া ফিরিতেছেন ; দরজায় লাট-বেলাটের ছাপ-মারা গাড়ি। তার পর কতকাল চলিয়া যায়, ক্রমে শিল্পী সাধক রসিকেরা আসিতে থাকে। জাপানি পুতুলের মত জাপানি সাধক ওকাকুরা, তপস্বিনী উমার সহোদরার মত ভগিনী নিবেদিতা, চৌকাঠের কাছে ইতস্ততঃশীল ব্রহ্মবান্ধব। তার পরে আরও যুগ যায়। শিরা-বাহির-করা দৃঢ় মুষ্টিতে ধৃতযষ্টি গান্ধীর প্রবেশ ; দ্রুতপদ-বিক্ষেপে কাঠের সিঁড়ি দিয়া বালকের উৎসাহে জহরলাল দোতলায় উঠিতেছেন। রামমোহন হইতে গান্ধী! উনবিংশ শতকের ব্রাহ্মমুহূর্ত হইতে বিংশ শতকের মধ্যাহ্ন! ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রারম্ভ হইতে ব্রিটিশ রাজত্বের উপান্ত! সদ্যজাগ্রত আভিজাত্যের আদি হইতে ক্লান্তপ্রায় মধ্যবিত্তসম্প্রদায়ের যুগান্ত। নব্যবঙ্গসংস্কৃতির সমগ্র সুরসপ্তকের সঙ্গে পরিচিত এই প্রাসাদ। ভারতীয় সংস্কৃতির ধ্বনি ও বিশ্বসংস্কৃতির প্রতিধ্বনি এখানে বসিয়া শোনা যায়। জোড়াসাঁকোর এই বাড়ি বাংলা সাহিত্যের ক্ষুধিত পাষাণ।

এই ক্ষুধিত পাষাণের কথা আছে ঘরোয়া আর জোড়াসাঁকোর ধারে -তে। সবটাকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে অপরাহ্ণিক বিষাদের একটা ছায়া, যুগাবসানের ক্লান্তি, জীবনাবসানের প্রশান্ত করুণতা। যে আদর্শের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ জন্মিয়াছিলেন সেই আদর্শের নিষ্ফল অভিসার জীবনের সায়াহ্নে শিল্পীকে আজ ভিতরে ভিতরে ব্যথাইয়া তুলিয়াছে। চারি দিক সেই আদর্শের কীর্তিচূড়ার স্খলনে ধ্বনিত ; তার তলে শিল্পীর হৃদয় চাপা পড়িয়া গুমরিয়া গুমরিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিতেছে। কান পাতিয়া শুনিলে বই-দুইখানিতে সেই চাপা আর্তনাদ শুনিতে পাওয়া যায়—

কত অভিনয় কত খেলা করে, কত সুখদুঃখের দিন কাটিয়ে,
সেই জোড়াসাঁকোর বাড়ি মাড়োয়ারী ধনীকে বেচে বের হতে হল
যেদিন আমার নিজের ছেলেপিলে বউঝি নিয়ে· ·

এ একটি যুগলক্ষণাক্রান্ত বিশেষ ঘটনা। কেবল পরিবার-বিশেষের বাস্তুভিটা-পরিত্যাগ নয়। দেউলে পুরাতন আদর্শের নূতনকে সিংহাসন ছাড়িয়া দিয়া পথে বাহির হওয়া। গৃহলালিত শিল্পের বাজারে আসিয়া দোকান-তোলা! নূতন যুগের নূতন হাওয়া—

বরজ করজোড়ে কহিল, প্রভু, মোদের সভা হল ভঙ্গ।
এখন আসিয়াছে নূতন লোক, ধরায় নব নব রঙ্গ।

এ আর শুধু বরজলালের গানভঙ্গ নয়, একেবারে তাহার গৃহভঙ্গ।

কথায় কথায় অবনীন্দ্রনাথের শেষজীবনে আসিয়া পড়িয়াছি। তিনি নিজেও তাঁহার জীবনান্তের সমে ফিরিয়া আসিয়াছেন। জীবনকথা-লেখক জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া আর-একবার শৈশবে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এখন আবার নূতন করিয়া তাঁহার ছেলেখেলা শুরু হইয়াছে। রং কৌশল শিল্পজটিলতা একে একে সব ঝরিয়া গিয়াছে, আছে কেবল তাঁহার শিশুদের পুতুলগুলি। একদিন শৈশবে পুতুল খেলিয়াছেন; আজ পরিণত শৈশবে তিনি পুতুল তৈরি করিয়া সময় যাপন করেন; সে পুতুল লইয়া তাঁহার অন্তরের চিরশিশু খেলা করে। এখন আর তিনি রাজকাহিনীর বর্ণাঢ্য রচনা লেখেন না; বর্ণবিরল ঘটনাবিরল যাত্রা লেখেন, মারুতির পুঁথির কিস্তূতের দেশে চিরশিশু যথেচ্ছ বিহার করিয়া বেড়াইতেছে। তাঁহার চিত্রও এখন বর্ণরূপ ও পারিপাট্য ত্যাগ করিয়া সরলতম রেখায় আত্মপ্রকাশ করিতেছে; 'আমার এ গান ছেড়েছে তার সকল অলংকার।'—

অলকার রংছুট ময়ূরী এল। সে জগতে সে রঙের অপেক্ষা রাখে না। সেই যে কুঞ্জে নূপুর বাজে সেখানে রংছুট ময়ূরী খেলা করে।